ফতেনগরের লড়াই

বিক্রমাদিত্য

বেঙ্গল পাবলিশার্স
কলিকাতা-১২



প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৬২

প্রকাশক – শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর—অজিতমোহন গুপ্ত

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

৭২।১, কলেজ স্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদপট-শিল্পী

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

আড়াই টাকা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক ও শ্রীযুক্তা আরতি দেবীকে
দিল্লীর হেমন্তের কয়েকটি দিনের স্মরণে

এই লেখকের ঃ

দেশে দেশে (২য় সংস্করণ)

খুনী দরওয়াজা

পূর্বাভাস

ফতেনগরের রাজা।

বেশ জাঁদরেল রাজাই বলতে হবে। দেশ ভর্তি তার ধনদৌলত, বাগানবাড়ি, আরো কতো কী ?

কিন্তু রাজার মনে নেই শান্তি। কেউ শোনেনি তার ঐশ্বর্যের কাহিনী। কেউ আসে না সেই দেশে।

রাজা ভাবেন ব্যাপারটা কী ? তাই একদিন মন্ত্রীকে শুধালেন : এ কী ব্যাপার ! আমার এই রাজত্ব, কোষাগারে আছে মণি-মুক্তা, পুকুরে মাছ, মাঠ ভর্তি শস্য। কিন্তু কেউ তো জানলে না এই রাজত্বের সম্পদের কথা।

মন্ত্রী নিরুত্তর। একটু বাদে মৃদুস্বরে বলেন : মহারাজ, যদি অনুমতি দেন, তবে এর কারণ বাতলাতে পারি।

রাজা অভয় দিলেন। বল্লেন : বলো, কোন্ কারণে আমার এই সোনার দেশ লোকচক্ষুর আড়ালে পড়ে আছে।

মন্ত্রী বলেন : মহারাজ, সেকালের রূপকথায় থাকতো রাজা, রাজত্ব আর রাজকন্যা। কিন্তু এ হলো বিংশ শতাব্দীর যুগ। এ যুগের রেওয়াজ হলো প্রেসিডেন্ট, পেপার আর প্রেস য়্যাটাশে।

সবিস্ময়ে রাজা প্রশ্ন করেন : মানে।

: মানে, অতি সহজ ও সরল। পাব্লিসিটি বিনা এ যুগে জীবন অচল। অর্থাৎ পাব্লিসিটি হলেই পাব্লিক তুষ্ট। কাজ হোক বা না হোক।

মন্ত্রীর জবাব শুনে রাজা জিজ্ঞেস করেন : তাহ'লে ফতেনগরের পাব্লিসিটি এতদিন হয় নি কেন?

একটু আমতা আমতা করে মন্ত্রী বলেন : যদি বলেন…

মন্ত্রীর কথা শেষ হ'বার আগেই রাজা গর্জে ওঠেন। উত্তর দেন…

বলেন মানে কী? আমি কোন অজুহাত শুনতে চাইনে। আমি চাই পৃথিবী জুড়ে এই দেশের খ্যাতি। জগৎময় সবাই বলুক এই দেশের ও দশের কথা। আজ থেকে সাতদিনের মধ্যে যদি এর কোন বন্দোবস্ত না করতে পারো তাহ'লে তোমার গর্দান…

বাকীটা শোনার প্রয়োজন মন্ত্রীর হলো না। তিনি কী জানেন না সাতদিনের মধ্যে ফতেনগরের নাম দেশব্যাপী ছড়াতে না পারলে তার গর্দানের কী পরিণাম হবে।

রাজাকে অভয় দিয়ে মন্ত্রী সরে পড়লেন।

* * *

সাতদিন বাদে ফতেনগরে এক বিপ্লব স্নুরু হলো।

প্রজারা ধরেছে হাতিয়ার।

বিদ্যুৎগতিতে সেই কাহিনী চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

সবার মুখেই শুধু একই কথা—ফতেনগর—আর বিপ্লব।

খবর পেয়ে নানাদিক থেকে আসতে লাগলো সাহায্য। কেউবা জানালেন সহানুভূতি। কারু কাছ থেকে এলো অস্ত্র, লাঠি-সোটা, বন্দুক, গুলী।

আর সেই লড়াই'র কাহিনী রিপোর্ট করতে এলেন পাঁচজন প্রেস রিপোর্টার।

এই কাহিনীর বাকী অংশটুকু সেই রিপোর্টারদের ভাষায় শুনুন।

* * *

—এক—

টেলীগ্রাম হাতে দিয়ে নিউজ-এডিটার বললেন : তৈরী হয়ে নাও, আজ রাতের প্লেনেই রওনা হতে হবে।

খবর এসেছে ফতেনগর থেকে যে, সেখানে বিপ্লব সুরু হয়েছে। প্রজারা নিয়েছে হাতে হাতিয়ার। অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি চাই, এই তাদের দাবী।

মনে হলো রূপকথার কাহিনী। রাজ-অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে উঠেছে প্রজা তাই দলে দলে যেয়ে রাজপ্রাসাদ করেছে ঘেরাও।

কিন্তু এ কাহিনী বিংশ শতাব্দীর রূপকথা। এতে আছে আধুনিকতার গন্ধ। এ সংগ্রাম রাজ-বিদ্রোহ নয়; কারণ, স্বয়ং রাজাই এ বিদ্রোহের নেতা।

*　　　　*　　　　*

আমি খবরের কাগজের রিপোর্টার, সংবাদের জহুরী। খবর সংগ্রহ করা শুধুমাত্র আমার পেশা নয়, নেশাও বটে। আমি ইতিহাস সৃষ্টি করিনে, রচনা করি ইতিহাস।

আমি ঘুরি দেশ-দেশান্তরে খবরের সন্ধানে। রূপার বদলে রূপকথা লিখি। লোকে যা বলে তা জানি, যা বলে না, তা লিখি। অবশ্য এই খবরের অন্তে থাকে প্রশ্নবোধক চিহ্ন অর্থাৎ কিনা এ রকম ঘটনা ঘট্‌তে পারতো।

রিপোর্টার আমি, তাই বহু জনের করুণার পাত্র। কেউ কেউ স্নেহ করেন। বীমার-প্রতিনিধি ও প্রেস-রিপোর্টার, এই দুই শ্রেণীই বহু জনের কাছে এক পর্যায়ভুক্ত। বহু লাঞ্ছনা ভোগ করার পর বীমা-প্রতিনিধি যখন আত্মসম্মানের শেষ মাত্রায়

পৌঁছেন, তখন তিনি সে স্থান থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। কিন্তু আমি রিপোর্টার, লাঞ্ছনা ভোগ থেকে রস আহরণ করি, সংবাদ শুষে নিই।

এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা আমাদের হিংসে করেন। অর্থাৎ আমাদের জীবনযাত্রার কাহিনী শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন : কী সুন্দর জীবন আপনাদের! যদি এমনি একটা···

আমি জানি এর পরে এঁরা কী বলবেন। অর্থাৎ তাঁরা যদি আমাদের মতো রিপোর্টার হ'তেন।

আমি হলপ করে এ কথা বলতে পারি যে, তাহলে তাঁরা এ কথা বলতেন না। কারণ এ জীবনে আনন্দ নেই, আছে কষ্ট, পয়সা নেই, আছে গ্লানি। আজ দীর্ঘদিন ধরে বহু সহকর্মীকে দেখছি এই লাঞ্ছনা ভোগ করতে। অনিদ্রায় বহু রজনী কেটেছে সংবাদের প্রতীক্ষায়, প্রত্যুষে শূন্য হাতে ফিরে আসা, দুর্গম পথ অতিক্রম করা, এ সাংবাদিক-জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা। কিন্তু কখনো দেখিনি কারো মুখের হাসি ম্লান হ'তে, কখনো তারা নিরুৎসাহ হ'ননি। যখন দেখেছি তাঁদের সফলকাম হতে, হাত বোঝাই করে যখন তাঁরা এনেছেন সংবাদ, তখন অধৈর্য পাঠকের কাছ থেকে প্রশংসা কুড়াননি, নীরবে গঞ্জনা শুনেছেন।

রিপোর্টার-জীবনের এই এক পরিচ্ছেদ। অপর অংশ, সে কথাই আমার আজ এ কাহিনীর বিষয়বস্তু।

* * *

রাত দুপুরে গাড়ি এসে মৌজপুরে পৌঁছল। আম্বাই থেকে দিল্লী, তারপর শিকারপুর। এই স্থানের দূরত্বকে অতিক্রম করেছি বিজ্ঞানের সাহায্যে অর্থাৎ প্লেনে। বিংশ শতাব্দীর এই বাহনকে তাই মনে মনে ধন্যবাদ জানালাম।

শুধু কী তাই? হুকুম দিয়ে নিউজ-এডিটার খালাস হলেন। বাকী ঝক্কিটা নিজের ঘাড়েই নিতে হলো। অল্প সময়, অথচ তৈরী

হয়ে নে'য়া চাই। সাংবাদিক-জীবনের এই চিরন্তন নীতি। যখন হাতে সময় থাকে তখন সংবাদের হয় অভাব, যখন সংবাদ থাকে তখন মেলে না সময়।

তাই দু'ঘণ্টা সময় পাবার জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম। মনে মনে বলেছিলাম যে, এই কয়েকটি ঘণ্টার ব্যতিক্রমে, ফতেনগর রণাঙ্গনে হয়তো এমন কিছু ঘটবে না যার জন্যে কোন জবাবদিহি দিতে হতে পারে।

* * *

স্টেশন নিস্তব্ধ। যাত্রীর কোলাহল নেই, নেই কুলীর হাঁক-ডাক। শুধু মাত্র অন্ধকারের বিভীষিকা বিরাজ করছে।

আমার কামরায় সহযাত্রী দু'জন। একজন মাড়োয়ারী, অপর জন বাঙ্গালী। এরা দু'জনেই যাবেন লাহেড়িপুরে।

মাড়োয়ারী সহযাত্রীটি ব্যবসায়ী। এ কথা ভাবতে দ্বিধা বা সংকোচ বোধ করিনি। কারণ ও-জাতের সঙ্গে হিসাব-নিকাশের কথা ছাড়া আর কিছু স্মরণ করা সম্ভব নয়। ব্যবসা ওদের বাপ-দাদার সম্পত্তি। আমার এ অনুমান যে সত্য, এর প্রমাণ অবশ্য পরে পেয়েছিলাম।

সহযাত্রী দু'জনেই গভীর নিদ্রায় অচেতন। তার প্রমাণ পেয়েছিলাম নাকের সিম্ফনি শুনে। সিম্ফনি বলার হেতু আছে। কারণ, দুজনেরই নাসিকাধ্বনি বেশ ভাল করে হচ্ছিলো, একজনেরটা একটু মোটা, অপর জনের বেশ মিহি।

কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে টের পেলাম যে, আমার এই ধারণা সর্বৈব মিথ্যা। অর্থাৎ নিদ্রার ভাণ ও নাসিকাধ্বনি করা এক সূক্ষ্ম আর্ট, যার নিদর্শন ট্রেণ ভ্রমণে সচরাচর পাওয়া যায়। এতে পারদর্শী হতে হলে থাকা চাই মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে সুগভীর জ্ঞান।

একটু বাদে কামরার নিস্তব্ধতা ভেদ করে এলেন অপর এক সহযাত্রী। অন্ধকারের ঝাপসা আলোতে বয়স আন্দাজ করতে পারলাম না, তবে বুঝতে পারলাম যে, ভদ্রলোক আমারই সমবয়সী হবেন।

ভদ্রলোক কামরায় উঠে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন: বাপস্, আজকাল ট্রেণে যাত্রা করা হচ্ছে নরকে যাওয়া। যাক্, এবার একটু নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমুনো যাবে।

নিজের মাল গুছিয়ে নিতে লাগলেন ভদ্রলোক। হঠাৎ সহ-যাত্রীদের মধ্যে একজন মুখ থেকে কম্বল সরিয়ে নিয়ে বললেন: বলি যাওয়া হবে কতো দূর ?

বলা বাহুল্য প্রশ্নকর্তা বাঙ্গালী।

নীরস কণ্ঠেই নবাগত ভদ্রলোক জবাব দিলেন: লড়াইতে। ফতেনগরে যুদ্ধ লেগেছে, শোনেন নি বুঝি ? রীতিমতো 'মর্ডান ওয়ার'।

মনে হলো যেন আমার কামরায় বোমা পড়লো। এক ঝট্‌কা দিয়ে সহযাত্রী দু'জনেই উঠে বসলেন। তারপর সুরু হলো প্রশ্নবাণ।

ফির লোড়াই, তবতো চান্দিকা বাজার বোহুত চড়া হোগা ? মাড়োয়ারী সহযাত্রী প্রশ্ন করেন। অপর জন বলেন: কী বলেন ম'শাই! আবার যুদ্ধ! 'এয়ার রেড' শুরু হয়নি তো ?

এক মুহূর্তে আমার কামরা সরগরম হয়ে উঠলো।

* * *

আসর জমিয়ে তুললেন এই দুই সহযাত্রী। মাড়োয়ারী একটা সিগারেট বার করে নবাগত ভদ্রলোকটিকে দিলেন। বললেন: একটা সুখটান দিয়ে লিন মোশয়। দিল তাজা হোবে।

বাঙ্গালী সহযাত্রী বের করলেন পানের ডিবা। বললেন: বৌদির হাতের সাজা পান দাদা, খেয়ে দেখুন। আচ্ছা বলুন তো, ঘুস্তুরী হিল-স্টেশনে উঠে শত্রুপক্ষ বোমা ফেল্‌তে পারে কিনা ?

আমি তো ভাবছি এ সময়টা একটা হিল-স্টেশনেই কাটাবো। দেখবো কোন শালায় জানে মারে। কী বলেন ?

এবার মাড়োয়ারী সহযাত্রীর বিক্রম দেখাবার পালা। জিহ্বা তালুতে ঠেকিয়ে একটা শব্দ করে বলেন : আরে ছো:, লোড়াইতে ভাগবেন কেন ? মার্কিট গোরম আছে, পয়সা বানিয়ে লিন। বিবিজানকে ভেজিয়ে দিন বাহার, আউর আপ রহিয়ে জান মার্কিটে। সোনার দাম বাঢ়বে, লোহা মিলবে না। খতরা আগে বঢ়বে তো ট্রাঙ্ক রোড আছে কীসের জন্যে। লোটা আউর কম্বল লিয়ে স্রিফ হাজির হোবেন বিবিজানের কাছে। আপ বঙ্গালী আদমী পোয়সা বনাবার ফিকির জানে না।

পান চিবুতে চিবুতে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ওঠেন বাঙ্গালী ভদ্রলোক। বলেন : আরে কেয়া বক্‌বকাতা। গত লড়াই যব হলো তব তুম সব তো পালায়াথা। ও-সব বিক্রম-টিক্রম হম্‌কো মাত বলো, হাম্‌ তুমারা মাফিক বহুত সাহসী আদমী দেখা।

মাড়োয়ারী জবাব দেন : আপ কেতো জানেন সাহব। পিছমে লোড়াই যব হলো অম্‌নি গভরিমিণ্ট হমায় খবর ভেজলো। লোড়াই তো হমি চালালাম।

এই বাগ্‌যুদ্ধে এবার নবাগত সহযাত্রী যোগ দেন। বলেন : শেঠজী আপনি গত যুদ্ধে আর্মিতে ছিলেন বুঝি ?

: তোবা, তোবা ! কী বলেন সাহব। চিত্রিমল থোড়াই লোড়াই করবে। লোড়াই করবে পোলটন। হামি শাসা লোড়াই চালাই।

: বা: সে কী রকম ! যুদ্ধে আপনি নেই, অথচ লড়াই চালালেন আপনি ?

: ওহি তো সব্‌সে বড়ী বাত্‌। যব লড়াই সুরু হোলো, ডাক পড়লো চিত্রিমলের। ভেজো মাল। চিনি, ঘি, অড়হরকা কনট্রাক্‌ট

মিলঙ্গো। হমি শালা চিনির জগহ দিলাম স্নুজি, ঘিকা জগহ চর্বি, আসল চর্বি, আউর অড়হরকা জগহ পাথরকা কংকর।

একটা আর্তনাদ শোনা গেল কম্পার্টমেন্টে। সবাই প্রায় এক সঙ্গেই প্রশ্ন ক'রলাম : এ তো রীতিমতো রাহাজানি দেখছি। গভর্ণমেন্ট কিছু বললো না।

: চিত্রিমলকে বোলবে এতো হিম্মত আছে কোন শালার। হমি তো মাল ভেজিয়ে দিলাম, আউর ইদিকে হমার সাদা পলটন সব ওহি জগহ থিকে ভাঁগলো। মাল হাতে পড়লো দুষমণের। ওহি শালা সব চীজ খেলো, হলো কলেরা। দুষমণের পলটন হলো সাফ। হমার সাদা পলটন গিয়ে ফির ওহি জগহ দখল করলো। সরকার হলো খুস, রায় বাহাদুর খেতাবভী মিললো, আউর সাথ সাথ কন্ট্রাকট্। হমি তো পহেলেসে জানতাম যে হমার সাদা পলটন ভাগবে, আউর হমার মাল যাবে দুষমণের হাতে। ইসি লিয়ে তো দিয়ে দিলাম চিনির জগহ-স্নুজি, ঘি'র জগহ চর্বি, আউর অড়হরকা জগহ পাথর।

বাঙ্গালী ভদ্রলোক এতেও সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি মানতে রাজী ন'ন যে সত্যিই গত যুদ্ধে চিত্রিমলেরা লড়াই করেছে। তিনি বাদানুবাদ থেকে নিরস্ত হলেন না।

পরের স্টেশনে যখন গাড়ি এসে থাম্‌লো, তখন বক্তাদের কণ্ঠ সপ্তমে উঠেছে। সেই কণ্ঠস্বর শুনে এক চেকার সাহেব আকৃষ্ট হলেন। তিনি আমাদের কামরায় এলেন।

চেকার সাহেব টিকিট চেক করতে লাগলেন।

: আপনার টিকিট ?—চেকার সাহেব বাঙ্গালী ভদ্রলোকের কাছে যান।

: এ কি, এ যে দেখছি থার্ড ক্লাশের টিকিট! এটা সেকেণ্ড ক্লাশ। আপনাকে 'ডিফারেন্স' দিতে হবে।

ভদ্রলোকের কণ্ঠের সেই তেজ এক মুহূর্তে নিবে গেলো। কাকুতি-মিনতি করতে লাগলেন। বললেন: কী করবো, স্যর, বড্ডো তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছি। পরিবারকে উঠিয়ে দিয়েছি পাশের কম্পার্টমেণ্টে। নিজে আর কোথাও জায়গা পেলুম না, তাই উঠে পড়লুম এ কামরায়। এবারটার মতো এক্সকিউজ করে দিন স্যর।

: পারবো না, চেকার সাহেব বলেন। আপ্‌কা টিকিট শেঠজী।

: হুজৌর তো ভোগবান আছেন। টিকিট তো হমার সাথ নেই, আছে শাদীলালের কাছে। হমার পার্টনার।

: কোথায় তোমার শাদীলাল ?

: ওঃ শালা ইস্ ট্রেণে নহী আস্‌ছে, পোরের ট্রেণে জরুর আসবে।

: ও সব ফাঁকিবাজি চলবে না, ভাড়া ফাইন শুদ্ধ দিতে হবে।

: হুজৌর গাড়ি মাপড়া স্টেশনে এলো, হমি শাদীলালকে দিলাম পোয়সা। বোললাম যা টিকিট খরিদ কোরকে লিয়ে আয়। শালা পোয়সা লিয়ে ভাগলো আউর ইদিকে গাড়ি ছুটলো। হমি জল্‌দি এহি কম্পার্টমেণ্টে চড়িয়ে বোসলাম।

: ও সব ফাঁকিবাজী চলবে না। পয়সা বের করুন। কোথায় যাবেন, লাহেড়িপুর ? দিন, সতেরো টাকা পাঁচ আনা, আর আপনার, ছয় টাকা দশ আনা।

শেষের কথাগুলো বাঙ্গালী ভদ্রলোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলা।

* * *

ট্রেণ এসে পৌঁছল লাহেড়িপুরে। তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। কামরায় আছেন শুধু নবাগত ভদ্রলোকটি।

গাড়ি আবার চলতে সুরু করে দিলো। আমার বার বার মনে হতে লাগলো নিউজ-এডিটারের উপদেশ। তিনি বলে দিয়েছেন যে, ফতেনগরের এই সংগ্রাম জবরদস্ত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই। অন্যায়ের

বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ। আমাদের কাগজের নীতি হবে এই সংগ্রামকে মর‍্যাল 'সাপোর্ট' দেয়া। অতএব আমার রিপোর্ট যেন সেই দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয়, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অন্তর্বিপ্লবের সংবাদ সর্বপ্রথম জানা গেলো দুপুরে। বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ এসে প্রথমে এই খবর সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের জানালেন। তাঁরা বললেন যে, দেশের প্রজারা এই সংগ্রামের জন্যে তৈরী হচ্ছে। যদি প্রয়োজন হয় তবে তারা সবাই প্রাণ দেবে।

এক সাংবাদিক তখন তাদের প্রশ্ন করলেন: তোমারা কী করে লড়বে? তোমাদের কাছে যে কোন হাতিয়ার নেই! তোমরা হচ্ছো নিধিরাম সর্দার, ঢাল নেই, তরোয়াল নেই।

বিপ্লবী দলের নেতা জবাব দিলেন: ভয় পেও না, নিধিরাম প্রয়োজন হলে বাঁশ দিয়েই লড়বে। তোমাদের দেশের কোন কবি না বাঁশের অজস্র প্রশংসা করে গেছেন। বলেছেন ঐ মারাত্মক অস্ত্র থাকলে দেশ জয় করা যায়।

বলা বাহুল্য, এই নেতাটি অতি খাঁটি কথাই বলেছিলেন। কারণ ফতেনগরের সমস্ত লড়াই প্রায় বাঁশের সাহায্যেই হয়েছিল। আর যেটুকু ত্রুটি ছিল সেটুকু আমরা সমাধান করেছিলাম, কলমের সাহায্যে।

* * *

দিল্লীর সাংবাদিক মহলে এই বিপ্লবের খবর যখন পৌঁছল তখন রীতিমতো এক উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। মন্টিগ্রীল রেস্টুরাণ্টে বসলো বিভিন্ন কাগজের বিশেষ সংবাদদাতাদের বৈঠক।

কৃপাশঙ্কর 'নতুন সমাচারে'র বিশেষ প্রতিনিধি। বুড়ো মানুষ, জীবনের অনেক কিছু দেখেছেন, তাই তাঁর এ জগৎ সম্বন্ধে বেশ অভিজ্ঞতা আছে। মূল্য আছে তাঁর মতবাদের। একটা লিমন-

স্কোয়াসের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন : ব্যাপারটা তা হলে বেশ গুরুতর হয়ে দাঁড়ালো। আমি তো ভেবেছিলুম এ হাঙ্গামা দু-একদিনেই থেমে যাবে, বিপ্লবী দলের ফৌজ হয়ে যাবে সাবাড়। কিন্তু এ তো দেখছি, রীতিমতো থার্ড ওয়ার্লড ওয়ার।

রামগোপাল 'স্টার অব দি ইভনিং'-এর সংবাদদাতা। হেসে বললে : কী যে বলেন কৃপাশঙ্কর সাহেব! এই তো সবেমাত্র সুরু হলো। দেখবেন কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। আমার তো ভয় হয় শেষ পর্যন্ত না এই হাঙ্গামার ঢেউ পৃথিবী শুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে।

ব্যারী ব্রুকসন একটা বিলেতী কাগজের প্রতিনিধি। হুইস্কি গ্লাসে ঢেলে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিয়ে বলে : আমি তো অলরেডী বলে দিয়েছি সিচুয়েশান ভেরী ব্যাড। আচ্ছা ব্রাদার, বলতে পারো ফতেনগরের কতো ল্যাটীচুড লঙ্গীচুড।

: টুয়েন্টি ল্যাটীচুড, এইট্টি লঙ্গীচুড, জবাব দেয় রণধীর।

: স্রেফ গাঁজা! এইমাত্র আমি ম্যাপ দেখে এলুম, ওটা হবে এইট্টি ল্যাটীচুড ও টুয়েন্টি লঙ্গীচুড, উত্তর দিলে রামগোপাল।

: মাল টেনে দাদার সুর তো একটু বেসুরো হয়েছে দেখছি। কী রাবিশ বক্‌ছেন। এনসাইক্লোপিডিয়া খুলে তবে আমি ডেস্‌প্যাচ লিখেছি। সে কি মিথ্যে হতে পারে?

রামগোপালকে উদ্দেশ্য করে রণধীর বলে।

ব্যারীর তখন বেশ আমেজ এসেছে। এবার সে বাদানুবাদে যোগ দেয়। বলে : ওসব ল্যাটীচুড লঙ্গীচুডের আমি থোড়াই কেয়ার করি। একটা হলেই হলো। তবে কী জানো, আমি এর চাইতে জবর খবর পেয়েছি। একদম টপ সিক্রেট।

: কী ব্যাপার? সোৎসাহে সবাই প্রশ্ন করে।

: আজ ভোরে ফতেনগরের এম্বাসীতে গিয়েছিলুম এম্বাসডারের সঙ্গে দেখা করতে।

: তারপর মোলাকাৎ হলো ?

: এম্বাসডার স্পষ্ট বলে পাঠালে সে দেখা করবে না।

: বলো কি, ভেরী ব্যাড, বলে কৃপাশঙ্কর।

: ইন্‌সালটিং ও হাইহ্যাণ্ডেডনেস্, মন্তব্য করে রামগোপাল।

: এর একটা বিহিত হওয়া প্রয়োজন দাদা! আমাদের সঙ্গে মামদোবাজী চলবে না, স্পষ্ট বলে দিচ্ছি। উত্তেজনায় রণধীর টেবিলে মুষ্টাঘাত করলে।

: কিন্তু আমি ঘাবড়াবার পাত্তর নই, বলতে থাকে ব্যারী। এম্বাসডার দেখা করলে না তো বয়েই গেলো। আমি চাঁহু ঘুঘু রিপোর্টার। দু' মিনিটের মধ্যে ওর ভালেটের সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে নিলুম। পেট থেকে বের করে নিলুম সব কথা।

: কী বললে ও ব্যাটা, সবাই প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করে।

: ব্যাটাকে জিজ্ঞেস করলুম এম্বাসডার সাহেব খানা খেয়েছেন ? ব্যাটা জবাব দিলে, না সাহেব।

রণধীর চীৎকার করে বলে উঠে : ইনডাইজেশন আর কী।

: তোমার মাথা আর মুণ্ডু, বলে রামগোপাল। এম্বাসডারের না খাওয়ার মানে হচ্ছে যে, তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন।

: অর্থাৎ কিনা খবর বিশেষ খারাপ, কৃপাশঙ্কর জবাব দেয়।

: শুধু কী তাই, ব্যারী বল্‌তে থাকে। ভ্যালেট আমায় বললে যে সাহেব কাল অনেক রাত অবধি জেগে ছিলেন।

: হয়তো কোন জরুরী খবরের প্রত্যাশায়, বলে রণধীর।

: এইবার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, রামগোপাল বলতে থাকে, যে কাল গভীর রাত্রে ফতেনগর থেকে খবর এসেছে সেখানকার পরিস্থিতি

খারাপ। নইলে আর এম্বাসডার অনর্থক রাত জেগে কাটাবেন কেন? আর আজ ভোরে দুশ্চিন্তায় ব্রেকফাষ্ট খেতে পারেননি।

: আর একটা জবর খবর আছে, ব্যারী বলে।

সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠে : কী?

: বলছি, বলছি, একটু সবুর করো। তবে কী জানো ভায়া, কথা বলতে বলতে গলাটা একদম শুকিয়ে গেছে। একটু ভিজিয়ে নে'য়া দরকার।

: কী খাবে ব্রাদার! হুইস্কি না বিয়র? কী বললে, জিন! তথাস্তু, সবাই মিলে এক সঙ্গে অর্ডার দেয়। জিনের সঙ্গে লাইম ও সোডা মিশিয়ে নেয় ব্যারী। তারপর চামচ দিয়ে নাড়তে থাকে। গলাটা একটু খাটো করে নিয়ে বলে : খবরটা একদম টপ সিক্রেট ব্রাদার। কাউকে আর বলো না। আমি অল রেডী আমার কাগজে 'কেবল' পাঠিয়েছি। থ্রি হাণ্ড্রেড ওয়ার্ডের স্টোরী। ব্যাপার কী জানো? আজ সকালে এম্বাসডার-গিন্নী তাঁর ধোপাকে ডেকে বলেছেন বিকেলের মধ্যে এম্বাসডারের কাপড় চাই। দেরী হলে চলবে না, বিশেষ জরুরী দরকার। ব্যাপার কী বুঝলে?

: অহো, আর বলতে হবে না, বলে রামগোপাল। এবার সমস্ত ব্যাপারটা একদম সহজ ও সরল হয়ে গেছে। এতো শীগ্‌গিরই কাপড় চাওয়ার মানে হচ্ছে, এম্বাসডার সাহেব আজই কোথায় পগার পার হচ্ছেন।

কৃপাশঙ্কর গম্ভীর হয়ে পড়ে। বলে : দ্যাট মীন্‌স এম্বাসডার হ্যাস বিন রিকল্‌ড। অর্থাৎ তাকে দেশে ফিরে যেতে বলা হয়েছে।

রণধীর জবাব দেয় : বিরাট স্কুপ। ভেরী বিগ স্টোরী। আমি চললুম, আর আধ ঘণ্টা বাদে আমার ডাক সংস্করণ প্রেসে যাচ্ছে। দিস নিউজ 'মাষ্ট গো'।

'রামগোপাল বলে: আর মাত্র পঁয়ত্রিশ মিনিট। 'স্টার অব দি ইভিনিং' 'বেড়ে' যাবে। থ্যাঙ্ক ইউ ব্যারী ফর দি স্টোরী।

একই সঙ্গে সবাই মন্টিগ্রীল থেকে বেরিয়ে এসে নিজ নিজ দপ্তরে গেলো।

* * *

সেদিন বিকেলবেলা 'স্টার অব দি ইভিনিং'-এর প্রথম পাতায় বিশেষসংবাদদাতা কর্তৃক এক খবর বেরুলো। আটচল্লিশ পয়েন্টের হেড লাইন।

খবরে বলা হোল: আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, ফতেনগরের হিলীর রাজদূতকে তাহার রাজধানীতে ফিরিয়া যাইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে আশংকা করা যাইতেছে যে, ফতেনগরের রাজনৈতিক অবস্থা বিশেষ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। ইহা জানা গিয়াছে যে, কাল গভীর রাত্রি অবধি রাজদূত জাগিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহার গভর্ণমেণ্ট হইতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ পাইয়াছেন।

এই সংবাদ প্রকাশের ত্ব'ঘণ্টা পরে ফতেনগরের রাজদূতাবাসে থেকে এ খবরের প্রতিবাদ করা হলো। বলা হলো—রাজদূতের দেশে ফিরে যাবার কথাটা সর্বৈব মিথ্যা। এই সংবাদের কোন ভিত্তিই নেই।

রাজদূতাবাস থেকে প্রচারিত প্রতিবাদ-সংবাদ হাতে নিয়ে রাম-গোপাল হাসতে হাসতে বললো: স্পেলন্ডিড।

একটু বিরক্ত হয়েই রণধীর জিজ্ঞেস করে: স্পেলেন্ডিডের আবার কী হলো। এমন একটা ভালো খবর কনট্রাডিক্ট্ হলো?

: তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ রণধীর। দেখতে পাচ্ছো না এক ঢিলে ত্নটো খবর পাওয়া গেলো।

: তার মানে ? বিস্ময়ে রণধীর প্রশ্ন করে।

: অর্থাৎ কিনা, রামগোপাল জবাব দেয়, একটা অরিজিন্যাল স্টোরী যে রাজদূতকে ডেকে পাঠানো হয়েছে, আর দ্বিতীয় স্টোরী হলো—না, তাকে ডেকে পাঠানো হয়নি। এ কি চাট্টিখানি কথা হে, দু'টো স্টোরী একসঙ্গে পাওয়া ?

* * *

: প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখছেন ?

পেছনে তাকিয়ে দেখি নবাগত ভদ্রলোক। বললেন: কাল রাতে আর পরিচয়ের পালা সেরে নিতে পারিনি। যা দুটো লোকের পাল্লায় পড়েছিলাম। তা আমার নাম শৈল চৌধুরী, 'দৈনিক হরকরার' স্টাফ-রিপোর্টার। যাচ্ছি বাণীপুরে ওখান থেকেই ফতেনগরের যুদ্ধ 'কভার' করবো।

আমার পরিচয় দিলাম। শৈল সে পরিচয়ে খুসী হলো। বললো: রক্ষে করলেন দাদা। রিপোর্টারের কাজ আমি একদম করিনি বলতে পারেন।

কথাটা শুনে বিস্মিত হলাম। জিজ্ঞেস করলাম: সে কী মশায়, রিপোর্টারের কাজে আনকোরা, তবু এলেন এই 'বিপ্লব' কভার করতে ? কী ব্যাপার ?

: সে কী আর ইচ্ছে করে এসেছি ম'শায়। বাধ্য হয়ে এলাম। তবে শুনুন আমার কাহিনী—এ একেবারে অপূর্ব, অতুলনীয়ই বলতে পারেন।

* * *

—দুই—

দুপুর বেলা।

'দৈনিক হরকরা'র নিউজ-এডিটার সাধনবাবু গালে হাত দিয়ে বসেছিলেন। গালে হাত না দিয়ে যদি মাথায় হাত দিয়ে বসতেন, তা হ'লেও অন্যায় কিছু হতো না। কারণ, প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজ 'দৈনিক সমাচার' হরকরার 'মেয়েদের কথা' বিভাগ নিয়ে কতকগুলো অশোভন মন্তব্য করেছে।

'দৈনিক সমাচার' লিখেছে : আমরা জানিতে চাই 'দৈনিক হরকরা'র 'মেয়েদের কথা'র প্রকৃত লেখক কে ? ইহা কী সত্য যে, জনৈক পুরুষ 'মেয়েদের কথা' বিভাগ পরিচালনা করিয়া থাকেন ? পাঠকগণ, আপনারা দেখুন, 'দৈনিক হরকরা' কী ভেজাল জিনিস মেয়ে-মহলে চালাইতেছেন।

'দৈনিক সমাচারে'র এই মন্তব্য পড়ে সাধনবাবু একটু মুষড়ে পড়েছেন। কারণ, সমাচারের এই তীব্র মন্তব্য প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে নারী মহল থেকে বহু প্রতিবাদ এসেছে। শুধু তাই নয়, তাঁর কাছে খবর এসেছে যে পাড়ায়-পাড়ায় এই নিয়ে মেয়ে মহলে জটলা শুরু হয়ে গেছে। 'দৈনিক হরকরা'র প্রবঞ্চনা আর নাকি তাঁরা বরদাস্ত করবেন না ! অবলা জাতির প্রতি এই অসহায় উৎপীড়নের প্রতিকার চাই। আরো কতো কী ?

এমনি সময়ে 'হরকরা'র চীফ সব-এডিটার প্রিয়ব্রতবাবু ঘরে ঢুকলেন।

: আজকের কাগজটা পড়েছেন প্রিয়ব্রতবাবু ? সাধনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

: কাগজ তো আমি পড়ি না স্যর—প্রিন্টার তারাপদ বাবুই পড়েন। আমি নিউজগুলো এডিট করি। শুধু কর্মখালি কলামটিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিই—প্রিয়ব্রতবাবু জবাব দেন।

: আরে নাঃ নাঃ, আজকের 'সমাচার' পড়ে দেখুন। কী যা-তা লিখেছে আমাদের সম্বন্ধে। বলেছে 'হরকরা'র মেয়েদের কথা বিভাগ পুরুষেরা চালায় কেন?

সাধনবাবুর কথা শুনে প্রিয়ব্রত বাবু হাসলেন। তার পর বললেন : স্যর, 'মেয়েদের কথা' আমরা লিখবো না তো কারা লিখবে? আরে, মেয়েরা কি দৈনিক সংবাদপত্রে আর তাদের মনের আসল কথা খুলে লিখবে? মেয়েদের মনের কথা পুরুষেরা বলে এসেছে চিরকাল এবং লিখবেও চিরকাল।

প্রিয়ব্রত বাবুর এই অকাট্য যুক্তির প্রতিবাদে সাধনবাবুর আর ব'লবার কিছু নেই। শুধু বললেন : আচ্ছা কর্পোরেশনের রিপোর্টটা পড়ে দেখেছেন? ছিঃ ছিঃ, 'অসহ্য' বানানকে দন্ত্য স না লিখে, মূর্ধণ্য ষ লিখেছেন।

: ঐখানেই তো মজা স্যর! বানান শুদ্ধ করে লিখলে কি আর ঐ কর্পোরেশনের কর্তারা কোন প্রতিকার করতেন? ঐ রিপোর্ট পড়েও দেখতেন না। আর পাঠকদের কথা ছেড়ে দিন। ওরা কর্পোরেশনের নাম শুনলেই কাগজের পাতা উলটিয়ে নেন। এবার ঐ বানান ভুলের জন্যেই সবাইকে এই রিপোর্ট পড়তে হবে। আর কর্পোরেশনের কর্তাদের এই অসহ্য অবস্থার একটা হিল্‌লে করতে হবে। বানান ভুল করে রিপোর্ট প্রকাশ করার ঐ তো বাহাদুরী।

তার পর একটু গলার স্বর নামিয়ে বললেন : স্যর, মোদ্দা কথাটা শুনেছেন? 'দৈনিক সমাচার' নাকি স্বামী জিবিদানন্দের 'শনি ও বৃহস্পতি গ্রহের সংঘর্ষের দরুণ পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্যে'র উপর একটা

লম্বা বিবৃতি ছাপাচ্ছে। কালই নাকি 'ফ্রন্ট পেজে' ডবল কলামে ছাপবে। এই খবরটা যদি ওরা বের করে স্যর, তা হ'লে কিন্তু বিরাট ইসকুপ হবে।

কথাটা যে ধ্রুব সত্যি, এ সাধনবাবু বিলক্ষণ জানেন। কারণ, কোন এক সময়ে তিনি ঐ 'দৈনিক সমাচার'-দপ্তরেই কাজ করতেন। কিন্তু সামান্য এক কারণে কাগজের মালিক ব্রজানন্দ বাবুর সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়। ব্রজানন্দ বাবুর গুরু স্বামী জিবিদানন্দ 'ধর্ম ও নারী' সম্বন্ধেও একটা তথ্যপূর্ণ বিবৃতি দিয়েছিলেন। বিবৃতি প্রথম পাতায় প্রকাশ না হয়ে তৃতীয় পাতায় ছাপা হয়েছিল। শোনা যায়, গুরুদেব নাকি এতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলন। কারণ তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর বিবৃতিতে জোর না দেয়াতে 'নারী মহলে' তাঁর প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তাঁর ধারণা যে, মেয়েরা প্রথম পাতার পর কাগজ খুলে দেখেন না। আর ঐ প্রথম পাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন শুধু মাত্র উনুন ধরাবার সময় বা দুধ জ্বাল দেবার সময়। অতএব এই বিবৃতি তৃতীয় পাতায় ছাপা হ'বার দরুণ নারী মহলে যে এ নিয়ে কোন আলোচনা হবে না, এটাই ছিল তাঁর বক্তব্য ও অভিযোগ।

ব্রজানন্দবাবু তাঁর গুরুদেবের প্রতি এই তাচ্ছিল্য ভাব সহ্য করলেন না। সাধনবাবুর কৈফিয়ৎ তলব করলেন। অবশেষে সাধনবাবু চাকুরিটি খোয়ালেন।

সাধনবাবুর চাকুরি যাবার কথা 'দৈনিক হরকরা'র মালিক পতিতপাবন বাবুর গুরুদেব স্বামী খলিলানন্দের কানে পৌছল। গুরুদেবের আদেশেই সাধনবাবু 'হরকরা'র নিউজ এডিটার পদে বহাল হলেন।

স্বামী খলিলানন্দের সাধনবাবুকে 'হরকরা'য় নিযুক্ত করার আর একটা গৌণ কারণ ছিল। 'ধর্মক্ষেত্রে' স্বামী খলিলানন্দের একমাত্র

প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন স্বামী জিবিদানন্দ। কিছুদিন আগে স্বামী খলিলানন্দ ঠিক করেছিলেন যে, তিনি একটা অনাথ-আশ্রম বানাবেন। কথাটা লোকপরম্পরায় বেশ জানাজানি হয়ে গেলো। ব্যস, আর যায় কোথায়! স্বামী জিবিদানন্দের প্ররোচনায় 'দৈনিক সমাচা'র 'ইহা কী সত্য' কলামে লিখলো: 'অনাথ-আশ্রমের নামে যে ফাণ্ড করা হয়েছে সে টাকা যায় কোথায়? বলি, হাতীপুরের বাগানবাড়িটি কার? ওখানে স্বামী খলিলানন্দ এত ঘন-ঘন যাতায়াত করেন কেন? রাত দুপুরে ওখান থেকে ঘুঙুরের আওয়াজ পাওয়া যায়। ওটা কার ঘুঙুর?'

দৈনিক সমাচারে এই সংবাদ বের হবার সঙ্গে সঙ্গে অনাথ-আশ্রমের জন্যে চাঁদা বন্ধ হয়ে গেলো। শুধু তাই নয়, যারা চাঁদা দিয়েছিলেন তাঁরা উকিলের নোটিস পাঠালেন।

শুধুমাত্র এই একটি কারণে স্বামী খলিলানন্দ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জিবিদানন্দের উপরে চটে যাননি। রাগ করার আর একটি কারণ ছিল। স্বামী খলিলানন্দের ধারণা যে, তার যে নারী মহলে প্রতিপত্তি হয়নি, তার মূলে আছেন স্বামী জিবিদানন্দ। খলিলানন্দের শিষ্যার সংখ্যা খুবই কম।

এই সব কারণে স্বামী খলিলানন্দ চাইছিলেন স্বামী জিবিদানন্দকে জব্দ করতে। জব্দ করার সমস্ত কল-কৌশলই তাঁর জানা আছে। তিনি কি আর স্বামী জিবিদানন্দের বাল্যজীবনী জানেন না? স্বামী জিবিদানন্দ কেন সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে, এ তাঁর বিলক্ষণ জানা আছে; আর শুধু কি তাই? তিনি কি জানেন না যে, স্বামী জিবিদানন্দ পাশের বাড়ির······

থাকগে, তিনি আর এই সব কুৎসিত কথা নিয়ে ঘাঁটাতে চান না। তবে তিনি ঠিক করেছেন যে, তিনি তাঁর 'আত্ম-স্মৃতিতে' জিবিদানন্দের

সমস্ত তথ্য প্রকাশ করে দেবেন। এই 'আত্মস্মৃতি' শিগগিরই দৈনিক হরকরায় কিস্তিতে প্রকাশ হবে। তিনি জানেন যে, সাধনবাবু এক-জন উঁচুদরের লেখক। অতএব একাজে তাঁর সাহায্য বিলক্ষণ দরকার হবে। তাই তিনি সাধনবাবুকে দৈনিক 'হরকরা'য় নিয়ে এলেন।

সাধনবাবুর 'দৈনিক হরকরা'য় চাকুরি পাবার এই হলো সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। আজ প্রিয়ব্রতবাবুর মুখে স্বামী জিবিদানন্দের কথা শুনে তাঁর এই সমস্ত পুরানো কথা মনে হতে লাগলো।

কিন্তু তাঁর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেলো রিপোর্টার উমাকান্তের চিৎকারে।

: হৈ-রৈ ব্যাপার স্যার! ফতেনগরে লড়াই। রাজা বিদ্রোহ করেছে প্রজাদের বিরুদ্ধে—বলতে বলতে হন্ত-দন্ত হয়ে উমাকান্ত সাধনবাবুর ঘরে ঢুকলো।

: রাজা বিদ্রোহ করেছে প্রজাদের বিরুদ্ধে! বলেন কি মশায়! তাজ্জব কাণ্ড। না, প্রজা বিদ্রোহ করেছে রাজার বিরুদ্ধে—

প্রিয়ব্রতবাবু মন্তব্য করলেন।

: ঐটে তো 'চেক আপ' করিনি। এক্ষুনি 'চেক আপ' করে নিচ্ছি স্যর—বলেই ঝটকা দিয়ে উমাকান্ত বেরিয়ে গেলো। একটু বাদে ফিরে এসে বললো: ঠিক বলেছেন, প্রজারাই বিদ্রোহ করেছে। কিন্তু কি হৈ-রৈ কাণ্ড, লাঠি-সোটা, বন্দুক, আরো কতো কী? Men and Women of both sexes are fighting—

উমাকান্তর কথা শুনে প্রিয়ব্রতবাবু আবার একটু বিস্মিত হলেন। জিজ্ঞেস করলেন: বলেন কি? Men and Women of both sexes are fighting! এটা আবার কী ব্যাপার উমাকান্তবাবু?

: হেঁ, হেঁ, এইটেই তো মজার ব্যাপার। চিরকাল তো 'সব-এডিটরিই' করে এলেন—রিপোর্টারী তো আর কখনও করেননি?

'কলারফুল' ডেসপ্যাচের কী মর্ম বুঝবেন? ঐ জিনিসটা হলো আমাদের মনোপলি।

তারপর সাধনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন: বুঝলেন স্যর, সেদিন আমার একটা চমৎকার রিপোর্ট 'ডেস্ক' একদম নষ্ট করে দিয়েছে। নিউজরুমের যদি একটু 'নিউজসেন্‌স্' থাকতো তা হ'লে অমন চমৎকার রিপোর্টটা নষ্ট হতো না।

সাধনবাবু অবশ্য উমাকান্তর কথায় নজর দিলেন না। শুধু বললেন: লড়াই তা হলে লাগলো।

এবারও উমাকান্ত জবাব দিলে। বললে: লাগলো মানে, একদম হানড্রেড ইয়ার্স অব ওয়ার।

এবার প্রিয়ব্রতবাবুর বলবার পালা। জিজ্ঞাসা করলেন: আচ্ছা উমাকান্তবাবু, এই ফতেনগরটা কোথায়?

: এই রে সেরেছে! ওই আসল জিনিসটাই তো দেখিনি। নিউজ এজেন্সির খবর 'ক্রীডে' আসছিল—তাড়াহুড়ায় দেখা হয়নি। যাই চট্ করে দেখে আসিগে—বলেই উমাকান্ত চলে গেলো।

খানিকটা চুপ করে সাধনবাবু বললেন: প্রিয়ব্রতবাবু, ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো দাঁড়াচ্ছে দেখছি।

: ঘোরালো মানে? 'সিচুয়েশান সিরিয়াস'; আমি বলি কি এ খবর দিয়ে একটা স্পেশাল এডিশন বের করলে হয় না।

: ঠিক বলেছেন। চলুন লড়াইর খবরটা কর্তাকে দিইগে। উনি তো দপ্তরেই আছেন।

সাধনবাবু ও প্রিয়ব্রতবাবু কাগজের মালিক পতিতপাবনবাবুর কাছে গেলেন।

* * *

'দৈনিক হরকরা'র একমাত্র মালিক পতিতপাবনবাবু দপ্তরে তাঁর নিজের ঘরে বসে ঘুমুচ্ছিলেন। এই দিবানিদ্রার একটি গৌণ কারণ আছে। সংবাদপত্র জগতে পতিতপাবনবাবু বেশ জাঁদরেল লোক হলেও তাঁর নিজ অন্তঃপুরে কোন মর্যাদাই ছিল না। নিজ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কোন চিন্তাই তিনি করেননি। অন্ততঃ করবার চেষ্টা করেননি। কারণ, পতিতপাবনের পত্নী প্রিয়ভাষিণী কলহেতে এতো সুপ্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে, এ জন্যে 'দৈনিক সমাচার' থেকে পতিতপাবনবাবুকে বহু গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে।

একবার সাপ্তাহিক 'কর্কট' পতিতপাবনবাবুর নিঃসহায় অবস্থার উল্লেখ করে লিখেছিল—যিনি নিজের স্ত্রীকে কন্‌ট্রোল করতে পারেন না, তিনি কোন্ কারণে চালের কন্‌ট্রোলের প্রতিবাদ করেন? শুধু কি তাই? 'কর্কট' পতিতপাবনবাবুকে কোন্ কোন্ দিন দুর্গতি, লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল, কোন্ কোন্ দিন তাঁকে অভুক্ত থাকতে হয়েছিল, তার একটা ফিরিস্তি দিয়েছিল।

'কর্কটে'র জবাব পতিতপাবনবাবু বা তাঁর কাগজ দেয়নি। স্বয়ং পতিতপাবন-গৃহিণী দিয়েছিলেন। তাও পত্রে নয় ছত্রে, অর্থাৎ ছাতার সাহায্যে। আর শুধু কি তাই? প্রিয়ভাষিণী দেবী 'কর্কট'-সম্পাদককে 'দাম্পত্য কলহ' সম্বন্ধে একটি তথ্যমূলক প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন। কিংবদন্তি আছে যে, সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'বার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে এক বিশেষ আলোড়ন পড়ে যায় এবং বহু প্রবীন দম্পতি এই প্রবন্ধ পড়ে তাদের কলহ বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

আর এক ঘটনা ঘটেছিল এক জনসভায়! সভাপতি পতিত-পাবনবাবু। হঠাৎ কী এক কারণে সভায় একটু চাঞ্চল্য দেখা দেয় এবং সভার শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবকের দল হিম-সিম খেয়ে গেলো। ব্যস্, আর কথা নেই। বক্তৃতামঞ্চে

উঠে দাঁড়ালেন পতিতপাবন-গৃহিণী। মুহূর্তে জনতা শান্ত হয়ে গেলো। এমন কি ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের কান্না বন্ধ করে দিলে।

কিন্তু আজ কয়েক দিন যাবৎ পতিতপাবনবাবু ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিয়েছে। এই ঝগড়াটা অবশ্যি এক তরফাই বলা যেতে পারে; কারণ, স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করার সাহস পতিতপাবনবাবুর নেই।

এই কলহের মূল কারণ প্রিয়ভাষিণী দেবীর ভ্রাতা বুটলো। বহু দিন ধরে বুটলো বেশ বহাল তবিয়তেই ভগিনীপতির অন্ন ধ্বংস করছিল। ছোট-খাটো দুই-একটা সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রও এ বিষয়ে পতিতপাবনবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এর পরে পতিতপাবনবাবু বুটলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু আলোচনা বেশী দূর এগোয়নি। কারণ, প্রসঙ্গ উত্থাপন হওয়া মাত্র প্রিয়ভাষিণী দেবী গালে হাত দিয়ে বললেন: ক বললে? বুটলো কাজ করবে! কাজ করতে করতে ছেলেটা মরে যাক্ আর কি! বালাই ষাট, আমি থাকতে ওর কাজ করার কী দরকার?

বুটলোর অবশ্য এদিকে কোন ভ্রূক্ষেপই ছিল না। থাকবার কোন কারণও ছিল না; কারণ, সে ছিল থিয়েটার-ভক্ত এবং বন্ধু মহলে উদীয়মান অভিনেতা বলে তার যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে। সময় সময়ে বোনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে দু-একটা নাটকও মঞ্চস্থ করে।

এই সব শৌখীন নাটকের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে একবার 'দৈনিক সমাচার' লিখলে: দেশের এই সিনেমা-নাটকের দুর্গতির কারণ কী, তাহা কি দেশবাসী জানেন? নাটকের অবনতির কারণ বুটলো।

'সমাচারে'র এই তীব্র মন্তব্য পতিতপাবনবাবুর কানে পৌঁছল। তিনি গৃহিণীকে এ'কথাটা জানালেন। এই ব্যাপার নিয়ে গত রাত্রিতে স্ত্রীর সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হয়ে গেছে। রাগ করে স্ত্রী চেঞ্জে চলে গেছেন। অবশ্য, যাওয়ার সংকল্প অনেক দিন ধরেই ছিল কিন্তু মৌকা মেলেনি। এই ঝগড়া হবার পর সুবিধে হয়ে গেলো। আজ পতিতপাবনবাবুও স্ত্রীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে দপ্তরে বসে বসে ঝিমুচ্ছিলেন।

এমনি সময়ে নিউজ-এডিটর সাধনবাবু ও চীফ সাব-এডিটর প্রিয়ব্রতবাবু তাঁর ঘরে ঢুকলেন।

* * *

: লড়াই! বলেন কী? প্রায় চিৎকার করেই বলে উঠলেন পতিতপাবনবাবু।

: হ্যাঁ স্যর, ট্যাঙ্ক, কামান, গোলা-বারুদ, প্লেন, আরো কতো কী? দেখে তো মনে হচ্ছে যুদ্ধটা বেশ জম-জমাট হবে—সাধনবাবু বললেন।

: একেবারে হাণ্ড্রেড ইয়ার্স অব ওয়ার, বলেন প্রিয়ব্রতবাবু।

: কোন 'স্পেশাল এডিশন' বের করবো কি? আস্তে-আস্তে সাধনবাবু কথাটা পাড়লেন।

: বের করবো মানে? বের করেননি এখনও? কী যে করেন আপনারা! 'সমাচারে'র স্পেশাল-এডিশন এতক্ষণে হয়ত রাস্তায় হকারেরা বিক্রি করছে,—পতিতপাবনবাবু বেশ রুক্ষস্বরেই বললেন।

: আপনার আদেশ না পেলে কী করে করি স্যার! গতবার দেশনেতা বিজয়কেতু সমাদ্দারের মরবার ছয় ঘণ্টা আগে ওর মৃত্যু-খবর দিয়ে স্পেশাল-এডিশন বের করে কি হাঙ্গামাই না পোহাতে হয়েছিল! আমাদের স্পেশাল-এডিশন পড়বার জন্যে লোকটা সে যাত্রা টিকে গেলো।

সাধনবাবুর কথাটা অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি। বিজয়কেতু সমাদ্দারের মৃত্যু-খবর 'কভার' করেছিল 'গরম খবর' নিউজ-এজেন্সি। খবরটা ছিল 'সুপার ফ্ল্যাস'। Deshbhakti Bijoyketu Samaddar died here to day. আর সেই খবরের উপরে ছিল এম্বার্গো—Not to be Published or Broadcast before he dies—দৈনিক হরকরা এম্বার্গো লক্ষ্য করে নি। বিজয়কেতু সমাদ্দারের মৃত্যু-খবর দিয়ে বিশেষ সংখ্যা বাজারে বেরিয়ে গেলো।

রোগশয্যায় বসে বসে বিজয়কেতু 'স্পেশাল এডিশন' পড়লেন। তার পর হেসে ছেলেকে ডেকে বললেন: ওরে, দেখে আয় তো আমার জন্যে ময়দানে কোন শোকসভার আয়োজন হয়েছে কি না?

ছেলে এসে জানালে যে শোকসভার কোন আয়োজন এখনও হয়নি।

বিজয়কেতু ছেলেকে বললেন: ওরে, 'হরকরা'কে বলে দে, শোক সভার আয়োজন না হলে আমি অক্কা পাচ্ছিনে।

বিজয়কেতুর মৃত্যুর স্কুপটা 'দৈনিক সমাচার' 'মিস' করেছিল। তাই বিশেষ সংখ্যা বের করতে প্রায় ছয় ঘণ্টা দেরি হয়ে গিয়েছিল। বড়ো বড়ো হেড লাইন দিয়ে তারা বিশেষ সংখ্যা বের করলে। লিখলে: দেশভক্তি বিজয়কেতুর মৃত্যুতে দেশে গভীর শোকের ছায়া। হাজার-হাজার নর-নারীর শ্মশানঘাটে স্মৃতি-তর্পণ।

এ খবরটাও বিজয়কেতুর কাণে গেলো। পড়ে তিনি খুশিই হয়েছেন বোঝা গেলো। বললেন: না—এবার দেখতে পাচ্ছি যে দেশবাসী সত্যিই আমায় ভালবাসে। আর নয়, এবার কাগজওয়ালাদের কথা রাখতে হবে।

'দেশভক্তি বিজয়কেতু শেষ-নিঃশ্বাস ফেললেন।'

আজ পতিতপাবনবাবুকে সাধনবাবু আবার সেই দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। সত্যিই তো, লোকটা বেঁচে থাকতে 'হরকরা' এতো পাব্লিসিটি দিলে, আর মরবার সময় 'হরকরার' কথা না রেখে 'সমাচারের' কথা রাখলে! ঘোর অন্যায়।

কিন্তু পতিতপাবনবাবু দমবার পাত্তর ন'ন। 'সমাচারের' কাছে তিনি হার মানতে রাজী ন'ন। বললেন: কে দিয়েছে খবরটা?

: 'গরম খবর' নিউজ এজেন্সি,—সাধনবাবু জবাব দেন।

: আর দেরি নয়। এক্ষুণিই স্পেশাল-এডিশন বের করে দিন। আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে বেশ একটা কড়া সম্পাদকীয়। রমণীবাবু কোথায়? ডাকুন না তাকে!

'হরকরার' সম্পাদক রমণীবাবু, কোন দিনই তিনি ঝামেলার পক্ষপাতী ন'ন। সাধনবাবুর উপর কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে খালাস। দিনে শুধু মাত্র একটা সম্পাদকীয় লেখেন। তা-ও লিখতে কষ্ট হয় না। আর বিশেষ করে বিদেশী খবর হ'লে তো কথাই নেই। কারণ, তাঁর সম্পাদকীয় প্রথম প্যারাগ্রাফে থাকে 'লণ্ডন টাইড' কাগজের সম্পাদকীয়র প্রথম প্যারাগ্রাফের অনুবাদ। দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে থাকে 'লণ্ডন হারিকেন এক্সপ্রেসে'র সম্পাদকীয়র অনুবাদ। তৃতীয় প্যারাগ্রাফে থাকে 'পিপল্স ভয়েস' কাগজের শেষ প্যারাগ্রাফ।

এই ভাবে সম্পাদকীয় লেখা রমণীবাবু বিশেষ ভাবে পছন্দ করেন। কারণ, তিনি বলেন যে, প্রথম প্যারাগ্রাফে থাকবে নিরপেক্ষ মতবাদ, দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে থাকবে রক্ষণশীল দলের মতবাদ এবং শেষ প্যারাগ্রাফে থাকবে গরম-গরম বামপন্থী বুলি। দেশের জন্যে, জনসাধারণের জন্যে। এই ধরনের সম্পাদকীয় নাকি জনসাধারণ পড়তে চায়।

আর দেশী খবর হলে তো তার উপর সম্পাদকীয় লিখতে কোন কষ্টই নেই। শুধু বিলেতি সম্পাদকীয়গুলোকে একটু 'রিটাচ্' করে দিশী ধাঁচে লিখলেই হলো। এই তো সেদিন শরণার্থীদের উপর একটা কড়া সম্পাদকীয় তাঁকে লিখতে হয়েছে। 'প্যাপাল' দেশে শরণার্থীদের নিয়ে যে বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে, তারই উপর 'লণ্ডন টাইড' যে সম্পাদকীয় লিখেছে তিনি তারই উপর ভিত্তি করে এই সম্পাদকীয় লিখেছেন। লোকপরম্পরায় তিনি জানতে পেরেছেন যে, তাঁর এই সম্পাদকীয় সবারই খুব মনোমত হয়েছে। এমন কি, দেশের সরকারেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

অবশ্য রমণীবাবুর সম্পাদকীয় লেখা ছাড়া আর একটা বাই আছে। সেইটি হলো ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়া। আগাথা ক্রিস্টি, কনান ডয়েল, এডগার ওয়ালেস, কিরীটি রায় তাঁর মুখস্থ। আজ বসে বসে তিনি মোহন সিরিজের 'বার্লিনে মোহন' পড়ছিলেন।

এমনি সময় চাপরাসী এসে খবর দিলে যে, পতিতপাবনবাবু তাঁকে ডাকছেন।

*　　　*　　　*

ঃ রমণীবাবু, ভীষণ কাণ্ড,—পতিতপাবনবাবু বললেন।

মোহনের রেশ তখনও রমণীবাবুর কাটেনি। কাজেই তিনি একটু অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দিলেন ঃ কী হলো স্যর, মোহন ধরা পড়েছে কী ?

রমণীবাবুর ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ার বাই পতিতপাবনবাবু জানেন। তাই তিনি একটু রেগে গেলেন। বললেন ঃ আপনি এখনও ঐ ছাই-পাঁশগুলো পড়ছেন ? কী যে করেন আপনি !

রমণীবাবু ইতিমধ্যে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছেন। নিজের ভুল বুঝতে পারলেন ও একটু লজ্জা বোধ করলেন।

পতিতপাবনবাবু বলতে লাগলেন : না, আপনাকে দিয়ে কিস্সু হবে না। সাধনবাবু, আপনি কাগজ-পেনসিল নিয়ে আসুন। আজকের সম্পাদকীয় আমি নিজেই লিখবো।

পতিতপাবনবাবুর এই সর্বপ্রথম সম্পাদকীয় লেখা। সম্পাদকীয় বললে ভুল হ'বে, এই তাঁর সর্বপ্রথম কাগজ-পেনসিল নিয়ে বসা। বিবাহিত জীবনেও তাঁকে কোন দিন প্রেম-পত্রাদি লিখতে হয় নি, কারণ, প্রেমপত্রে প্রিয়ভাষিণী দেবীর আদৌ বিশ্বাস ছিল না।

পতিতপাবনবাবু বলতে থাকেন, সাধনবাবু টুকে নে'ন।

...আবার লড়াই! এ তো লড়াই নয়, এ তো রীতিমতো জেহাদ—

তার পর রমণীবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন : রমণীবাবু, আমাদের কাগজের পলিসি কী?

মালিকের প্রশ্ন শুনে রমণীবাবু একটু হকচকিয়ে গেলেন। পলিসিটা যে কী সেটা রমণীবাবুও ঠিক জানেন না। কারণ বিদেশী সংবাদ দেখে তাকে দৈনন্দিন পলিসি ঠিক করতে হয়। তাই একটু আম্‌তা আম্‌তা করে বললেন : উইক পলিসি এ্যাট হোম, স্ট্রং ফরেইন্‌ পলিসি।

: তা হ'লে ফতেনগরটা কোথায়? দেশে না বিদেশে? সাধন-বাবু, ফতেনগর দেশী না বিদেশী—

সাধনবাবুর হয়ে চট্‌পট্‌ জবাব দিলেন প্রিয়ব্রতবাবু। বললেন : ফতেনগরটা যে কোথায় সেটা এখনও নিউজ এজেন্সি জানায় নি। আমি বলি কি, কড়া-নরম সুর মিলিয়ে বেশ একটা কিছু লিখলেই হবে।

: ঠিক বলেছেন প্রিয়ব্রতবাবু! আচ্ছা লিখুন, সাধনবাবু—যুদ্ধ চাই নে। চাই শাস্তি। আচ্ছা 'শান্তি' বানান কী রমণীবাবু?

: স্থায়ী শান্তি চাইলে তালব্য শ, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী 'শান্তি' হলে দন্ত্য স হলেই চলবে। কিন্তু ঐ শান্তি বানান নিয়েই জগতে বড়ো ঝামেলা চলছে স্যর! ঐ বানান-সমস্যা সমাধান না হওয়া অবধি এই জগতে আর শান্তি ফিরে আসবে না। আমি বলি কি, ঐ শান্তি শব্দের বদলে অন্য কিছু একটা লিখলেই চলবে। বরং লিখতে পারি···

যুদ্ধ চাইনে—চাই দুর্বৃত্তের দমন।

'বার্লিনে মোহন' বইতে রমণীবাবু পড়ছিলেন যে, মোহন দুর্বৃত্ত দমনে বের হয়েছেন। এমনি ভাবে যে এই শব্দটা ব্যবহার করতে পারবেন, এটা তিনি আশা করেননি। এবার যথোপযুক্ত শব্দের ব্যবহার করতে পেরে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করলেন।

: ঠিক কথা। চাই দুর্বৃত্তের দমন···আচ্ছা বাকি কথাগুলো আপনি লিখে দিন রমণীবাবু। কিন্তু দেখবেন সম্পাদকীয় যেন বেশ জোরালো হয়।

: সে কথা আপনি চিন্তা করবেন না। এমনি জোরালো প্রবন্ধ লিখবো যে, লড়াই বন্ধ হয়ে যাবে। এই তো কাল 'হারিকেন এক্সপ্রেস' তৃতীয় মহাসংগ্রামের উপর বেশ জুৎসই সম্পাদকীয় লিখেছে। তারই উপর ভিত্তি করে লিখবো।

অনেকক্ষণ ধরে সাধনবাবু মনিব-সম্পাদকের কথা শুনছিলেন। কোন মন্তব্য করেন নি। এবার বললেন: একটা কথা আছে স্যর! লড়াই বাধলো। ফ্রণ্টে কাউকে এই লড়াই রিপোর্ট করতে পাঠালে হয় না?

: মানে ইংরেজী ভাষায় যাকে বলে War Correspondent—সংশোধন করে বলেন প্রিয়ব্রতবাবু।

রমণীবাবু মাত্র সেদিন ভোরে আগাথা ক্রিস্টির এক বইতে যুদ্ধের সময় গুপ্তচরদের তৎপরতা সম্বন্ধে একটি রোমাঞ্চকর কাহিনী

পড়েছেন। শুধু তাই নয়। এই মাত্র তিনি পড়ছিলেন যে, মোহন বার্লিনে গিয়ে 'এ্যাটম বোমার' গোপন তথ্য বের করার জন্যে কী আপ্রাণ চেষ্টাই না করছে। তার কাগজেও ফতেনগরে গুপ্তচরদের কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে লেখা প্রকাশ করতে তিনি ইচ্ছুক। এই সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদই একমাত্র ছাপা যায়। অতএব রমণীবাবু ভাবলেন যে, ফ্রণ্টে একজন সংবাদদাতা পাঠান যুক্তিসঙ্গতই হবে। সায় দিয়ে বললেন: 'ছাট্‌স্ রাইট। উই মাস্ট হ্যাভ এ রিপোর্টার এ্যাট ফ্রণ্ট'। আমি বলি কি, প্রিয়ব্রতবাবু বা উমাকান্তকে পাঠানো হোক।

কথাটা বলেই রমণীবাবু উৎকণ্ঠার সঙ্গে পতিতপাবনবাবুর মুখের দিকে জবাবের জন্যে তাকিয়ে রইলেন।

এবার পতিতপাবনবাবুর ভাববার পালা। কথাটা মন্দ বলেনি সাধনবাবু। ওয়ার করেসপণ্ডেণ্ট পাঠিয়ে তিনি 'দৈনিক সমাচার'কে এক হাত দেখিয়ে দেবেন। কিন্তু মোদ্দা কথা হলো টাকা। একটা লোক পাঠাতে যে অনেক খরচ। আচ্ছা এমন কিছু করলে হয় না, টাকাও খরচ হলো অথচ ঘরের টাকা ঘরেই রইলো।

দি আইডিয়া! বুটলোকে পাঠালে কেমন হয়? কিন্তু ওকে পাঠানো ঠিক হবে কী? যদি গিন্নী আপত্তি করেন? আপত্তি করার সুযোগ পাবে কখন? গিন্নী তো চেঞ্জে গেছেন। বুটলোর একটা হিল্লে হয়ে যাবে আর ঘরের টাকা ঘরেই থাকবে।

: কথাটা মন্দ বলেন নি আপনারা। কিন্তু আমি বলছিলাম কি, এ লড়াইতে ইয়ং ব্লাড পাঠানো দরকার। কী বলেন রমণীবাবু। এ ছাড়া ধরুন উমাকান্ত বা প্রিয়ব্রতবাবুর পরিবার আছে। লড়াই'র কথা তো বলা যায় না। ধরুন যদি তাদের অকল্যাণ ঘটে। না রমণীবাবু, এ সব লড়াইর ব্যাপার, ছেলে ছোকরার কাজ। আমার

শালা বুটলোকে জানেন তো। খাসা কবিতা লেখে। আমি বলি কি, ওই রিপোর্টার হয়ে যাক ফ্রণ্টে। সাধনবাবু, ওকে আমি পাঠিয়ে দেবো'খন আপনার কাছে। কাজ কর্ম সব বুঝিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, টাকা-পয়সার জন্যে চিন্তে করবেন না।

পতিতপাবনবাবুর কথা শুনে প্রিয়ব্রতবাবুর মুখটা শুকনো হয়ে যায়। বড়ো আশা করেছিলেন যে ফ্রণ্টে যেতে পারবেন। 'ডেস্কে' বসে আর কপি 'এডিট' করতে ভালো লাগে না। ছুত্তোর ছাই! মালিকের শালার মুণ্ডুপাত করতে করতে প্রিয়ব্রতবাবু বেরিয়ে গেলেন।

*   *   *

একটু বাদে মনিবের ঘরে সাধনবাবুর আবার তলব হলো।

পতিতপাবনবাবু জিজ্ঞেস করলেন : কদ্দুর হলো, আপনার স্পেশাল-এডিশনের? বিকেল চারটে যে বাজে, এখনও কাগজ বের হয়নি। কী যে করেন আপনারা!

: না স্যর, আর বেশী বাকি নেই।—সাধনবাবু জবাব দেন।

: দেখে শুনে দিয়েছেন তো? প্রথম পাতায় বেশ বড়ো করে ছাপবেন কিন্তু। ঐ যে আপনাদের ইয়ে কী বলে···বেশ বড়ো-বড়ো অক্ষরে ছাপা। বলুন না রমণীবাবু ওগুলোকে কী বলে—

রমণীবাবু সামনেই বসে ছিলেন। কিন্তু তিনি জবাব দেবার আগেই সাধনবাবু বললেন : ব্যানার হেড লাইনের কথা বলছেন তো স্যার! ও সব তৈরি। কিস্সু ভাববেন না, দেখবেন আমাদের স্পেশাল-এডিশন হু হু করে বিকিয়ে যাবে।

সাধনবাবুর জবাব শুনে পতিতপাবনবাবু খুশিই হন, বলেন : হ্যাঁ, হ্যাঁ, ব্যানারগুলো বেশ জমকালো করে দেবেন। দেখলে যেন সবার তাক লেগে যায়। আর সবুজ কালিতে দেবেন কিন্তু।

মনে নেই গতবার 'সমাচার' নাট্যসম্রাজ্ঞী বিদ্যুৎলতার মৃত্যুতে 'লাল কালিতে' ব্যানার দিয়েছিল? তারপর, কী লিখলেন ব্যানারে।

: 'ফতেনগরে সংগ্রাম শুরু'—জবাব দেন সাধনবাবু।

: না, না, আর একটু গরম গরম ব্যানার দিন, যাতে চা'য়ের সঙ্গে খবরটা পড়তে পড়তে সবাই বেশ তাজা হয়ে উঠে। একটু যুৎসই ব্যানার দিন না, রমণীবাবু!

রমণীবাবু তখন বিভোর হয়ে ভাবছিলেন দস্যু মোহনের কথা। এতোক্ষণে মোহন হয়তো বার্লিনের সীমান্তে এসে পৌঁছেচে। আর একটু বাদে সে হয়তো হিটলারের সঙ্গে মোলাকাৎ করবে। এমনি সময় পতিতপাবনবাবুর ডাকে তার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেলো। বললেন: ব্যানার হেড লাইনের কথা বলছেন স্যর!

: নিশ্চয়ই, খুব জবরদস্ত ব্যানার দিন সাধনবাবু, যাতে পাঠক উত্তেজিত হয়ে উঠে। আচ্ছা, লিখুন ব্যানার হেড লাইন······ "ফতেনগরে লোমহর্ষক লড়াই!"

* * *

—তিন—

'দৈনিক হরকরা'র ঠিক উল্টো দিকেই 'দৈনিক সমাচারে'র দপ্তর।

দিনের বেলায় 'সমাচারে'র দপ্তর প্রায়ই নিস্তব্ধ থাকে। রাত্রে সজাগ হয়ে ওঠে।

দপ্তরের সামনে বসে থাকে একটি দরোয়ান। তার একমাত্র কাজ 'হরকরা' দপ্তরের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। ঐ দপ্তরে কারা এলো-গেলো। বহুদিন সংবাদপত্র-দপ্তরে কাজ করে দরোয়ানজীর

একটি অদ্ভুত ক্ষমতা হয়েছে। লোক দেখলেই বলতে পারে যে তার আগমনের কি কারণ।

যারা হতাশ হয়ে 'দৈনিক হরকরা' দপ্তর থেকে বেরোয় দারোয়ানজী যেচেই তাদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নেয়। উদ্দেশ্য 'হরকরা'র দপ্তরের ভেতরের খবর বের করে নেয়া।

*　　　*　　　*

আজ দপ্তরে বসে 'সমাচারে'র কর্তা ব্রজানন্দবাবু তাঁর কাগজ পড়ছিলেন এবং 'হরকরা'র সাথে মিলিয়ে দেখছিলেন যে কি কি খবর তাঁর কাগজ পায়নি। হঠাৎ একটা খবর পড়তে পড়তে তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো। তলব করলেন প্রুফরীডার নৃত্যহরিবাবুকে।

নৃত্যহরিবাবু এই দপ্তরের পুরানো কর্মচারী। কিন্তু আজ কয়েক মাস যাবৎ তাঁর মন প্রসন্ন নেই। কারণ, বহু তদ্বির করেও তিনি মনিবের কাছ থেকে তাঁর মাইনে বাড়াতে পারেননি।

: এই যে নৃত্যহরিবাবু, আজকের 'সমাচার' পড়েছেন? নৃত্যহরিবাবু ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজানন্দবাবু প্রশ্ন করলেন।

নৃত্যহরিবাবু স্পষ্ট বক্তা, তিনি জবাব দিলেন: 'সমাচার' আমি পড়ি নে স্যর!

: বলেন কি? কাজ করেন 'সমাচারে', অথচ কাগজ পড়েন না—বিস্মিত হয়েই ব্রজানন্দবাবু এ প্রশ্ন করলেন।

নৃত্যহরি অবিচলিত হয়েই জবাব দেন: না স্যর, আমি রোজ 'হরকরা' পড়ি। গিন্নী বলেন, তোমাদের 'সমাচারের' মুখে আগুন। পোড়ারমুখো কাগজ, আজ পর্যন্ত দুটো টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিতে পারলে না, ও কাগজ পড়ে কি হবে? আর শুধু কি তাই স্যর! 'হরকরা'র নারীর কাহিনী একটি ফার্স্ট ক্লাস কলাম।

মেয়ে মহল নিয়ে অমন চমৎকার আলোচনা আজ পর্যন্ত কেউ করতে পারলে না। ঐ কলামটা পড়লে আমার বড্ড ঘুম পায়। তাই তো ডাক্তার অষুধ না খেয়ে ঐ কলামটি রোজ পড়তে বলেছেন। আর আমার গিন্নীও ঐ কলাম বেশ পছন্দ করেন। পরশু দিন ওখান থেকে একটি রান্না করার পদ্ধতিও লিখে নিয়েছেন। মুর্গীর সন্দেশ।

নৃত্যহরির জবাব শুনে ব্রজানন্দবাবু স্তম্ভিত হলেন। আজ পর্যন্ত তাঁর দপ্তরের কোন কর্মচারীর বলবার সাহস হয়নি যে, 'সমাচারে'র চাইতে 'হরকরা' উৎকৃষ্ট কাগজ। কিন্তু নৃত্যহরির কথাগুলি হজম করা ছাড়া উপায় নেই। ফস করে হয়তো 'সমাচারে'র কাজ ছেড়ে দিয়ে 'হরকরা'য় চলে যাবে। তবু প্রশ্ন করলেন: 'সমাচার' পড়েন না তো কাজ করেন কি করে?

: কাজ করে অন্নদা স্যর, আমি তদারক করি।

এর পরে আর বলবার কিছু নেই। তবু কণ্ঠে একটু শ্লেষ মিশিয়ে ব্রজানন্দবাবু বললেন: বেশ, বেশ, আজকের 'সমাচারে'র তিন নম্বরের পাতার সেই 'বাসে চাপা পড়িয়া পথিকের মৃত্যু' খবরটা পড়ুন। কী ঘটেছে, আর আপনি কী ছেপেছেন। এই দেখুন, লেখা আছে: 'অতঃপর মৃতদেহ রিকসায় করিয়া স্বর্গে লইয়া যাওয়া হইলো।' ছি! ছি! নৃত্যহরিবাবু, ওটা 'স্বর্গে' নয়, ওটা 'মর্গে' হবে। আমাদের কাগজে এই রকম মারাত্মক ভুল দেখলে কি 'দৈনিক হরকরা' আর আস্ত রাখবে?

মনিবের কথায় নৃত্যহরিবাবু অবিচলিত রইলেন। জবাব দিলেন:
: কি করবো স্যর! মাইনে পাই পঞ্চাশ টাকা, তাও গত দু'মাস পুরো মাইনেটা পাইনি। এ টাকায় কি আর মৃতদেহ ট্যাক্সিতে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া চলে, এতে রিক্সাই ভালো।

রেগে কাঁই হয়ে উঠলেন ব্রজানন্দবাবু। কিন্তু কোন কিছু বলার আগেই ঘরে হুড়মুড় করে এসে ঢুকলেন 'সমাচারে'র সম্পাদক খগেনবাবু।

: স্যর হৈ-রৈ কাণ্ড! এই মাত্র খবর পেলুম 'দৈনিক হরকরা' স্পেশাল বের করছে।

: কী হলো আবার? জিজ্ঞেস করলেন ব্রজানন্দবাবু।

: এ কি চাট্টিখানি কথা স্যর! এমন চাঞ্চল্যকর কাহিনী এ আমলে শোনা যায়নি······

: আহা খুলেই বলুন না ব্যাপারটা কি? ব্রজানন্দবাবু এবার বেশ উৎকণ্ঠিত হয়েই এ প্রশ্ন করলেন।

: স্যর, লড়াই। আবার শুরু হলো রক্তের স্রোত।

: হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা লাগলো বুঝি?

: না স্যর! এবার তার চাইতে বড়ো। এবার ফতেনগরেই লড়াই বেধেছে। কিন্তু স্যর, আমি হলপ করেই বলতে পারি, এ সংগ্রাম অতি শিগ্‌গীরই সমস্ত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে—খগেনবাবু বেশ জোর দিয়েই বলেন।

খগেনবাবুর কথা শুনে ব্রজানন্দবাবু একটু গম্ভীর হয়ে পড়লেন। প্রথমটায় কিছু বললেন না। তারপর শুধু সংক্ষেপে বললেন: হুম্।

মনিবকে চিন্তা করতে দেখে খগেনবাবু একটু আমতা-আমতা করে বললেন: আমি বলছিলুম কি স্যর, 'হরকরা' তো স্পেশাল এডিশন বের করছে। আমাদেরও একটা বিশেষ সংখ্যা বের করলে হয় না?

: আলবাৎ। এক্ষুণিই বের করুন।

: আমার আর একটা প্ল্যান ছিল স্যর! আমাদের কাগজের প্রথম পাতায় স্বামী জিবিদানন্দের একটি বাণী ছাপানো দরকার।

মানে, এই যুদ্ধ ক'দিন চলবে, কে জিতবে, কে হারবে, এই নিয়ে একটা ফোরকাস্ট।

: ঠিক বলেছেন খগেনবাবু! আমি এক্ষুণি গুরুদেবের কাছে যাচ্ছি। প্রথম পাতায় ফোটো দিয়ে আমরা তাঁর বাণী ছাপবো —জবাব দিলেন ব্রজানন্দবাবু। খগেনবাবুর প্ল্যানটা তাঁর খুবই পছন্দ হয়েছে। তারপর একটু ভেবে বললেন: কোন রংএর কালিতে ব্যানার হেড লাইন দিচ্ছেন? গত বার 'হরকরা' নাট্যসম্রাজ্ঞী বিদ্যুৎলতার মৃত্যুতে কাল কালিতে ছেপেছিল। আমি জোর গলায় বলতে পারি, ওরা এবার হলদে কালির ব্যানার দেবে। আপনি এবার লাল রংয়ের ব্যানার দিন।

* * *

দু'কাগজের স্পেশাল এডিশন বেরুবার পর স্বামী খলিলানন্দ পতিতপাবনবাবুকে টেলিফোন করলেন।

: এটা কি ভালো করলে হে পতিতপাবন! কাগজ বের করবার আগে আমায়ও তো একবার স্মরণ করলে পারতে। 'সমাচার' জিবে শালার বাণী কাগজের প্রথম পাতায় ছেপে বসে আছে। আমিও তো ঐ রকম একটা কিছু বলতে পারতুম।

কথাটা ভেবে দেখলেন পতিতপাবনবাবু। মন্দ বলেননি স্বামী খলিলানন্দ। কাগজের প্রথম পাতায় লড়াই সম্বন্ধে গুরুজীর মন্তব্য থাকলে কাগজের কাটতি কতো বেড়ে যেতো এ কি তিনি আর জানেন না? কিন্তু এখন আর ভুল শোধরাবার উপায় নেই। সমস্ত কথাটা ভেবে পতিতপাবনবাবুর সাধনবাবুর উপর রাগ হ'তে লাগলো। সত্যি সাধনবাবুর ভুলের জন্যেই তাকে আজ গুরুদেবের কথা শুনতে হলো। না, কালকেই তাকে দপ্তরে গিয়ে এর একটা বিহিত করতে হবে।

* * *

সন্ধ্যার সময় বাড়িতে এসে পতিতপাবনবাবু শ্যালক বুটলোর তলব করলেন।

বুটলো থিয়েটারে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলো, কোন পেশাদার থিয়েটারে নয়, তাদের 'মন দেয়া-নেয়া' ক্লাবের থিয়েটারে। আজ ফুল ড্রেস রিহার্সাল হবে। তাই একটু সাজগোজ করে যেতে হচ্ছে। 'সাজাহান' মঞ্চস্থ করা হবে, বুটলো নিয়েছে জাহানারার পার্ট। প্রথমটায় সবাই বুটলোর এ পার্ট নিয়ে আপত্তি করেছিল, কারণ বুটলো লম্বায় ছয় ফুট, বুকের ছাতি আটত্রিশ ইঞ্চি হবে—ওজন প্রায় তিন মণ। কিন্তু এতো বাধা থাকা সত্ত্বেও বুটলোর কণ্ঠস্বর যে হুবহু জাহানারার মতো, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এমন বিশাল আকৃতি থেকে যে এই রকম মিহি কণ্ঠস্বর বেরুতে পারে এ বুটলোকে না দেখলে পর বিশ্বাস হয় না।

জাহানারার পার্ট বুটলোর কণ্ঠস্থ। কিন্তু কিছুতেই তার ঐ পার্টের ফিলিংস আসছে না। তাই আজ কয়েক দিন হলো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে অভিনয় মক্‌সো করছে। এমনি সময়ে পতিতপাবনবাবু ঘরে ঢুকলেন। জিজ্ঞেস করলেন : বুটলো কী কর্‌ছিস ?

: নাঃ নাঃ, কিছু না। ভাবছিলাম একটু বেড়িয়ে আসি গে। ঐ ময়দানে স্বামী খলিলানন্দ 'নারীর উপর ধর্মের প্রভাব' সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দিচ্ছেন।

ভগিনীপতির কাছে বুটলো থিয়েটারের কথাটা চেপে গেলো। ভগিনীপতিকে তার বড্‌ডো ভয়। বিশেষ করে থিয়েটারের নাম শুনলে পতিতপাবনবাবু যে আস্ত রাখবেন না, এ বুটলো বিলক্ষণ জানে, তাই একটু বানিয়ে সে জবাব দেয়।

: হুম্‌। বক্তৃতা শুনে দরকার নেই। আমার দপ্তরে যা। তোর জন্যে একটা কাজ ঠিক করেছি। রিপোর্টারের কাজ। রমণীবাবু

যা সাধনবাবুর সঙ্গে দেখা করগে। তোকে লড়াইতে যেতে হবে। রিপোর্ট করতে।

ভগিনীপতির কথা শুনে বুটলো স্তম্ভিত! তাই ক্ষীণ স্বরে বললো : লড়াইতে ?

: হ্যাঁ লড়াইতে—এক্ষুণি যা, রমণীবাবু ওরা তোর জন্যে দেরি করছেন।

পতিতপাবনবাবু ভাবলেন যে, স্ত্রী ফিরে আসার আগেই বুটলোকে রণাঙ্গনে পাঠানোর প্রয়োজন। নইলে রণাঙ্গনক্ষেত্র হয় তো তাঁর বাড়িতেই হবে।

বুটলোর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। এই সময়ে তার পক্ষে ক'লকাতা ছেড়ে যাওয়া অসম্ভব। সমস্ত থিয়েটারের সাকসেস্ 'জাহানারা' ওরফে বুটলোর উপরই নির্ভর করছে। এই সময়ে তার ক'লকাতা থেকে অনুপস্থিতি মানেই থিয়েটার পণ্ড হয়ে যাওয়া।

ভগিনীপতির কথাটা ভেবে দেখলে বুটলো। এ প্রস্তাবে রাজি হওয়ার অনেক বিপদ আছে। দিদি নেই, এ সময়ে হাতখরচের জন্যে ভগিনীপতির কাছেই তাকে হাত পাততে হয়। অতএব দিদির অবর্তমানে ভগিনীপতিকে চটানো সমীচীন হবে না। কিন্তু লড়াইতে যাওয়া! অসম্ভব!

হঠাৎ বুটলোর মাথায় যেন একটা 'প্ল্যান' এসে গেলো। দি আইডিয়া!

বুটলো 'মন দেয়া-নেয়া' ক্লাবের উদ্দেশে রওনা হলো।

* * *

বুটলোর প্রতি তার ভগিনীপতির আদেশ শুনে, 'মন দেয়া-নেয়া' ক্লাবে একটা করুণ আর্তনাদ উঠলো।

শম্ভু বুটলোর সাকরেদ। বললে : হ্যাঁরে বুটলো, তুই চলে গেলে আমাদের 'ক্লাব' যে বিধবা হবে।

বিজনের বাড়িতেই থিয়েটারের রিহার্সাল হয়। সে বলে উঠলো : বললেই হলো। 'জাহানারা'কে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া অতো সহজ ব্যাপার নয়। পুলিসে খবর দেবো।

জ্যোতিষ বললে : হ্যাঁরে বুটলো, তোর দিদিকে খবর দে না। উনি এলে আর তোকে হয়তো লড়াইতে যেতে হবে না।

বুটলোর মাথায় কিন্তু এ-সব কথা যাচ্ছিলো না। কারণ, সে ভাবছিল কি করে ফতেনগরে যাওয়া এড়ানো যায়।

এ-জন্যে তাকে সাহায্য নিতে হবে ক্লাবের সাহিত্যিক—শৈলর কাছ থেকে। বলতে গেলে শৈলই ক্লাবের নেতা। তার পরামর্শ বিনা কোন কাজই এখানে হয় না।

শৈল এক সময়ে কোন এক অখ্যাতনামা কাগজের সহকারী-সম্পাদক ছিলেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় সর্বপ্রথম ইহা কি সত্য কলাম সেই কাগজে শুরু হয়। তখন দেশে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার হিড়িক চলছে। প্রতিদিন "ইহা কি সত্য" কলামে লাট বাহাদুর, প্রধান মন্ত্রী, ও সরকারি দপ্তরের বড়ো-বড়ো অফিসারদের গোপন কথোপকথন প্রকাশিত হ'তে লাগলো।

সরকারেরও বলবার কিছু যো নেই। কারণ, এই গোপন কথোপ-কথনের পরে লেখা আছে ; "আমরা জানিতে চাই, ইহা কি সত্য ?"

অতি অল্প দিনের মধ্যেই 'ইহা কি সত্য' কলামের জনপ্রিয়তা বেড়ে গেলো।

কাগজের কাটতি যখন উর্ধ্বমুখে তখন একদিন ভোরবেলায় দপ্তরে গিয়ে শৈল দেখতে পেলো যে, দপ্তরের দরজা বন্ধ। দ্বার-প্রান্তে লেখা আছে : 'কাগজ লাটে উঠিল। ইহা কি সত্য ?'

এর পরে শৈল বেশ কয়েকটা দিন বেকার ছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন শুভ-মুহূর্তে তার বুটলোর সঙ্গে পরিচয় হয়। সেই থেকে সে বুটলোর গুরুর পদে অধিষ্ঠিত হয়ে আছে।

*　　　*　　　*

আজ বুটলো বসে ভাবছিল যে, এই বিপদ থেকে তাকে একমাত্র উদ্ধার করতে পারে শৈল। ভগিনীপতি যে কেন তাকে রিপোর্টার করতে চাইছেন, এটা বুটলোর বোধগম্য হলো না।

একটু বাদে ক্লাবে শৈল এসে উপস্থিত। বুটলোর চেহারা দেখে তো সে অবাক! বলে : এ কী রে বুটলো, তোর হলো কী?

: লড়াই, শৈলদা, লড়াই। ভগিনীপতি আদেশ দিয়েছেন তার কাগজের রিপোর্টার হয়ে ফতেনগরের লড়াইতে যেতে হবে।

: বড্ডো দুঃসংবাদ! এ সময়ে তোর কোথাও যাওয়া চলে না।

: আমিও তো তাই বলি। তবে কি জানো শৈলদা, আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে—বুটলো বলতে থাকে।

: শোন, তোমার খবরের কাগজের অভিজ্ঞতা আছে। আমি বলছিলুম, আমার হয়ে তুমিই ফতেনগরে লড়াই রিপোর্ট করতে চলে যাও। আমি এ ক'টা দিন এখানেই গা-ঢাকা দিয়ে থাকবো। আর কে যাচাই করতে যাবে যে তুমিই বুটলো নও? মানে ইয়ে কিনা, তুমি জাল রিপোর্টার হয়ে এসেছো।

কথাটা ভেবে দেখলে শৈল। প্রস্তাবটা মন্দ দেয়নি বুটলো, কে জানবে বিদেশে যে সে সত্যিই বুটলো নয়। আর এই শহরে একটানা থাকতে থাকতে তার ক্লান্তি এসে গিয়েছিল। কয়েকটা দিন বাইরে কাটিয়ে এলে মন্দ হয় না। হাতেও বেশ কয়েকটা পয়সা আসবে। জায়গাও দেখা হয়ে যাবে। এক ঢিলে দু'পাখি মারা যাবে।

যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। শৈল বললে : ঠিক বলেছিস্ রে বুটলো। আমিই যাবো তোর হয়ে লড়াইতে।

*　　　*　　　*

সেদিন রাত্রেই বুটলো গেল 'দৈনিক-হরকরা'-দপ্তরে। এডিটর-নিউজ এডিটরের সঙ্গে দেখা করে তাদের উপদেশ নিতে। তারপর এসে শৈলকে সমস্ত গুছিয়ে বলবে এই তার মৎলব।

*　　　*　　　*

কর্তার আদেশেই রমণীবাবুকে দপ্তরে থাকতে হয়েছিল। সাধারণতঃ তিনি সন্ধ্যার পর অফিসে থাকেন না। অন্ধকারে বাড়ি ফিরতে তাঁর গা ছম্‌ছম্ করে। এই সময়েই ডিটেকটিভ গল্পের দস্যু লুং চাং-এর কাহিনীগুলি মনে হয়! অতএব সাধারণতঃ তিনি সাঁঝের প্রদীপ জ্বালবার আগেই বাড়ি ফিরে আসেন।

কিন্তু আজ এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলো। কারণ যে কোন মুহূর্তে বুটলো দপ্তরে আসতে পারে। ফতেনগরের লড়াইটা যে কী ভয়াবহ ব্যাপার, এটা সম্পাদক হিসেবে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

বুটলোর সঙ্গে কি ভাবে আলোচনা শুরু করবেন, রমণীবাবু সেইটে ভাবছিলেন। মাত্র কিছুদিন আগে তিনি তরুণদের সঙ্গে বৃদ্ধের আলোচনা নিয়ে এক গভীর প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন : হে দেশবাসিগণ, তোমরা তরুণদের কচি মনে আঘাত দিও না। তা হ'লে তারা শুকিয়ে যাবে। তাদের কাছে চিত্র-তারকাদের নিন্দে করো না, কারণ তারা মুষড়ে পড়বে···

কিন্তু আজ বুটলোর সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে তার সমস্ত কথা যেন গুলিয়ে গেলো।

একটু বাদে বুটলো এসে উপস্থিত। রমণীবাবু সাদরে আপ্যায়ন করে বললেন : হেঁ, হেঁ, বসুন। বুটলো বসলো জাঁকিয়ে!

খানিকটা সময় চুপচাপ কেটে গেলো। রমণীবাবুই নিস্তব্ধতা ভাঙ্গলেন। বললেন : তৈরি হয়ে নি'ন। কালকেই রওনা হচ্ছে হবে ফতেনগরে। আপনি নিশ্চয় জানেন ফতেনগরটা কোথায় ?

: না, বেশ নির্লিপ্ত কণ্ঠেই বুটলো জবাব দেয়।

: আমি ভেবেছিলুম আপনি হয়তো জানেন। সত্যি কথা বলছি আপনাকে, কাউকে যেন বলবেন না। এ দপ্তরে কেউ জানে না এই জায়গাটা কোথায়। চার দিকে লোক পাঠিয়েছি জায়গাটার খোঁজ করতে। মায় জিওলজিকাল সার্ভে অবধি।

: তাহলে যাবো কি করে ? বুটলো যেন এ বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পাবার একটা পথ খুঁজে পায়।

: আহা, সে জন্যে চিন্তা করবেন না, জায়গা আমরাই খুঁজে বার করবো। আর না পেলে বয়েই গেলো। সেই বেয়াল্লিশ সালে 'সমাচার' কি করেছিল জানেন, আবিসিনিয়া থেকে প্যারী দখলের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী লিখলে। বেড়ে লিখেছিল ম'শায়। পাব্লিক তো থ'। এমনি মনমাতানো নিউজ নাকি বিংশ শতাব্দীতে কেউ পড়েনি।

আবার বেশ খানিকক্ষণ চুপ-চাপ।

রমণীবাবু বললেন : একটু চা আনতে বলি, কী বলেন ?

: আপত্তি নেই।

একটু বাদে দু' কাপ চা এলো। চাপরাসীকে চা হাতে করে দপ্তরে ঢুকতে দেখে সমস্ত রিপোর্টারি মহলে গুঞ্জন উঠলো। একজন আর একজনকে বললে : নিশ্চয় কোন মেয়ে এসেছে।

দ্বিতীয় রিপোর্টার জবাব দেয় : আরে না, না, ডিসপেপসিয়ার কোন রুগী নিশ্চয় এসেছে। নইলে, আজ কাল কেউ চা খায়। ছোঃ।

ইতিমধ্যে রমণীবাবু বুটলোর সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আলাপ তেমন জমলো না।

রমণীবাবু প্রশ্ন করলেন: এর আগে কখনো রিপোর্টারী করেছেন?

বুটলো বেশী কথা বলতে রাজি নয়। সে শুধু সংক্ষেপে জবাব দিলে: না!

: এক্সলেণ্ট। আর ভাববার দরকার নেই ম'শায়, কালই রওনা হয়ে পড়ুন।

: কিন্তু কি করে কাজ করবো? রিপোর্টারীর যে কিছুই জানিনে।

: ঐ তো মজার ব্যাপার ম'শায়। জানেন, একবার আমি এক ইস্কুলের অঙ্কের মাস্টার হয়েছিলুম। চাকুরি নেবার সময় হেড মাস্টার ম'শায় আমায় ডেকে বললেন: রমণীবাবু, আপনাকে অঙ্ক কষাতে হবে। আমি তো অবাক, ম্যাট্রিকে তিন তিনবার এই যোগ বিয়োগ করতে গিয়ে ফেল করলুম। তাই হেড মাস্টার ম'শায়কে নিবেদন করে বললুম: আজ্ঞে ঐ বিষয়টা আমায় পড়াতে দেবেন না। অঙ্কে আমি একদম কাঁচা। হেড মাস্টার ম'শায় হেসে কি বললেন জানেন? বললেন: রমণীবাবু ভয় পাবেন না। এই আমার দিকে তাকিয়ে দেখুন। ইংরাজীর এ, বি, সি, ডিও জানতুম না। তারপর যেই এই ইস্কুলে ছাত্রদের পড়াতে শুরু করলুম তক্ষুণি সব শিখে গেলুম। মায় গ্রামার অবধি। আপনি আজ থেকেই ছাত্রদের অঙ্ক কষাতে লেগে যান, দেখবেন দু'দিনেই সব শিখে যাবেন। ইস্কুলে ছাত্রেরা কি আর কোন কিছু শেখে ম'শায়, মাস্টারেরাই শেখে।

রমণীবাবু বলেন: অবাক কাণ্ড ম'শায়। হেড মাস্টার ম'শায়ের কথা দিব্যি ফলে গেলো। ছাত্রেরা অঙ্ক শিখলো না বটে, আমি শিখলুম। তাই বলছি বুটলোবাবু, রিপোর্টারী করতে করতে সব শিখে যাবেন।

একটু চুপ করে রমণীবাবু বললেন : শুনুন, ভয় পাবার কিস্সু নেই। এই পাশের ঘরে সাধনবাবু বসে আছেন। ওঁর সঙ্গে দেখা করুন গে। উনি 'ওয়ার কভারেজের' টেকনিক সব বলে দেবেন।

বুটলো চেয়ার ছেড়ে উঠলো।

রমণীবাবু বললেন : শুনুন, আর একটা কথা। ফ্রন্টে যাবার সময় বেশ কিছু ডিটেকটিভ বই নিয়ে যাবেন। বিশেষ করে 'হারকুল পয়রেটের' কাহিনী। ওর মধ্যে এমনি কয়েকটা কায়দা-কানুন আছে যা এই লড়াইর সময় বড্ডো কাজে লাগবে। চমৎকার বই—

ডিটেকটিভ বই পড়ার উপদেশ দিতে পারলে, রমণীবাবু থামতে চান না। কিন্তু হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, রাত বেশ হয়ে গিয়েছে। না, আর দেরি করা যায় না। আজ যে বইটা তিনি পড়েছেন সেখানে রাত্রির অভিযানের উপর একটি অধ্যায় আছে। সে কথা মনে হলে তাঁর গা শিউরে উঠে। রমণীবাবু উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন : ওয়েল, উইস ইউ দি বেস্ট অব লাক্।

বুটলো এবার নিউজ এডিটর সাধনবাবুর ঘরে ঢুকলো।

*　　　*　　　*

সাধনবাবু তখন 'কেসরুমে' গিয়েছিলেন, ফোরম্যানের সঙ্গে আলোচনা করতে। কিন্তু তাঁর টেবিলের চার পাশে বসে ছিল রিপোর্টার-সাব-এডিটরের দল।

বুটলো ঘরে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে চীফ সাব-এডিটর প্রিয়ব্রতবাবু বললেন : আপনিই বুটলোবাবু?

ঘাড় নেড়ে বুটলো জবাব দেয় : হ্যাঁ।

রিপোর্টার ব্যোমকেশ বললে : মানে আপনিই হলেন গিয়ে পতিতপাবনবাবুর ব্রাদার-ইন-ল।

আবার ঘাড় নাড়ে বুটলো।

: বেড়ে চান্স পেয়ে গেলেন ম'শায়। 'ওয়ার কভারেজ' তো চাট্টিখানি কথা নয়, আমরা তো ভেবেছিলুম 'স্টাফের' কেউ যাবে—একটু নিরাশার কণ্ঠ নিয়ে সাব-এডিটর প্রীতিবাবু বলেন।

: কিন্তু আমি তো কখনো লড়াই দেখিনি। রিপোর্ট করবো কী ?—বুটলো জবাব দেয়। ঘরের মধ্যে একটা চাপা হাসির গুঞ্জন উঠে গেলো। এ কথার মানে তাদের বিলক্ষণ জানা আছে। কোন একটা বড়ো রিপোর্টিং-এর কাজ পাবার আগে সবাই অনভিজ্ঞতার ভণিতা করে। সহকর্মী রিপোর্টারদের ধোকা দেবার ঐ তো হলো কায়দা-কানুন। এ কি তাদের জানা নেই ?

: রিপোর্ট আপনি থোড়াই করবেন। আসল কথা কী জানেন ? এই রকম 'এসাইনমেণ্ট' পেলে বেশ ফায়দা আছে। অবশ্যি আপনি না গেলে আমিই যেতুম—প্রিয়ব্রতবাবু উত্তর দিলেন।

: 'ফায়দা'! বিস্মিত হয়ে বুটলো প্রশ্ন করে।

এবার ব্যোমকেশের উত্তর দেবার পালা : আরে ম'শায়, ঐতো হচ্ছে মজার ব্যাপার। ফায়দা মানে, এই সব 'এসাইনমেণ্টে'র টি-এ বিলের কথা বলছেন প্রিয়ব্রতবাবু।

: আমি তো যাবো লড়াই করতে ম'শায়, টি-এ বিল করতে নয়,—বুটলো বলে।

: আলবৎ যাবেন টি-এ বিল বানাতে। সবাই করে ম'শায়। ডানকার্কের যুদ্ধে "গরম খবর" নিউজ এজেন্সির চটকবাবু কি করেছিলেন জানেন ? চার-চারটা টাইপ রাইটারের বিল করেছিলেন।

: কী করে ?

: সৈন্যদের সঙ্গে 'ল্যাণ্ড' করার সময় বললে, মেসিন হারিয়ে গেছে। তারপর শহর দখল করার সময় আর এক মেসিনের বিল বানালে। সেই মেসিন আবার পালিয়ে আসার সময় হারিয়ে গেলো।

এলো তিন নম্বর মেসিন। তারপর আবার শহর দখল করতে গিয়ে আর এক মেসিন কিনলে—ব্যোমকেশ বলে।

: আমি কিন্তু এর চাইতে মজার ব্যাপার জানি, ব্যোমকেশবাবু! প্রীতিবাবু বলতে থাকেন—রিপোর্টার হৈ-চৈ পতিতুণ্ডি, লড়াইর সময় কী করেছিল জানেন? বিল করলে —টু— যাতায়াত খরচ তিনশো টাকা।

সমস্ত ঘরে একটা আর্তনাদ উঠলো। ব্যোমকেশ বললে : সে কী ব্যাপার প্রীতিবাবু! জায়গার নাম উল্লেখ করলেন না, আর বিল বানালেন 'ড্যাস টু ড্যাস' যাতায়াত খরচ তিনশো টাকা! আশ্চর্যি!

: তা নয়তো কী মশায়! হৈ-চৈ কী কম ঘুঘু ছেলে! বিলের তলায় লিখে দিয়েছিল 'ফর সিকিউরিটি রিজনস্' মানে 'সামরিক নিরাপত্তার' জন্যে জায়গার নাম উল্লেখ করা গেলো না। অডিট ব্যাটা কিস্সু বলতে পারলে না। সুড়-সুড় করে বিলটি পাস করে দিলে।

: যা বলেছেন প্রীতিবাবু। লড়াই করতে যাওয়া মানেই 'প্রফিট'। আমি একবার চটকবাবুর বিল দেখেছিলাম। মরুভূমি পার হ'বার জন্যে কোম্পানি থেকে একটা উটের দাম তিনি আদায় করেছিলেন।

বুটলো এতোক্ষণ এদের কথাবার্তা শুনছিল। কোন প্রশ্ন করেনি। এবার কিছু না বলে পারলে না। কারণ এদের কথাবার্তা সবই যেন সাঙ্কেতিক ভাষা বলে মনে হচ্ছে। তাই বেপরোয়া হয়ে প্রশ্ন করলে : দেখুন আপনাদের এই 'প্রফিট' কথার মানে ঠিক বুঝতে পারলুম না। কথাটা যদি একটু পরিষ্কার করে বলেন, তা হ'লে একটু সুবিধে হয়।

ব্যোমকেশ জবাব দিলে : বলছি, কিন্তু দেখবেন পতিতপাবন-বাবুকে যেন এর কিছু বলবেন না। আচ্ছা ধরুন, আপনি ফ্রন্টে

গিয়ে আপনার বান্ধবীর জন্যে চকোলেট বা কিছু পাঠালেন—বিলে লিখবেন, এণ্টারটেনমেণ্ট বাবদ পঞ্চাশ টাকা। কাউকে যদি ফুলের তোড়া পাঠাবার ইচ্ছে হলো—অমনি লিখবেন, খবর সংগ্রহ বাবদ পনেরো টাকা, সিনেমায় যাবার ইচ্ছে হলো—'বক্সে' গিয়ে বসবেন। লিখবেন, 'কনভেয়েন্স ফর স্পেশাল ইণ্টারভিউ' পঁচিশ টাকা। বিশেষ প্রতিনিধি হয়ে যাবার এই তো মজা—

ব্যোমকেশের কথা শেষ হবার আগেই সাধনবাবু ঘরে ঢুকলেন। বুটলোকে দেখে বললেন: আরে আপনার জন্যেই তো এতোক্ষণ বসে আছি। ফতেনগরে রওনা হয়ে যান কালই। 'দৈনিক সমাচার' হয়তো তাদের রিপোর্টার এতোক্ষণে পাঠিয়ে দিয়েছে।

সাধনবাবু এবার বুটলোকে কয়েকটা উপদেশ দিলেন। বললেন: দেখবেন, 'হরকরার' মান-ইজ্জত আপনার উপরই নির্ভর করছে। ঐ 'সমাচারে'র রিপোর্টারের উপর খুব কড়া নজর রাখবেন। প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজ কিনা। ঐ ব্যাটা যদি বলে স্টেশনে যাচ্ছে, তবে বুঝবেন 'স্টোরি ফাইল' করতে ডাকঘরে যাচ্ছে। আর যদি বলে ডাকঘরে যাচ্ছে তবে বুঝবেন ইস্টিশানে যাচ্ছে, নিশ্চয় কোন বড়ো নেতা আসছে। এ লাইনে কাউকে বিশ্বেস করবেন না—কাউকে নয়। বেশ, তা হ'লে কাল সকালের ট্রেনেই রওনা হয়ে পড়ুন।

সাধনবাবুর কাছ থেকে আরো গোটা কয়েক উপদেশ নিয়ে বুটলো সোজা শৈলর বাড়িতে চলে এলো। শৈলকে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দিয়ে বললে: দাদা, সমস্ত মান-ইজ্জত তোমারই উপর নির্ভর করছে। এ যাত্রা রক্ষে করো। আজ থেকে তুমি বুটলো, আমি শৈল। টাকা পয়সার জন্যে চিন্তা করো না। 'হরকরা'-দপ্তরে শুনতে পেলাম যে এই ধরনের রিপোর্টিং নাকি রীতিমত 'প্রফিটেবল বিজনেস।'

* * *

সেদিন রাত্রেই 'সমাচার'-দপ্তরে খবর গেলো যে 'হরকরা' ফতেনগরে বিশেষ প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে। ব্রজানন্দবাবু খবরটা শুনতে পেয়ে বেশ গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। টেক্কা মেরে দিলে 'হরকরা' তাঁর উপর। উফ্, একজন বিশেষ প্রতিনিধি পাঠাবার কী খরচা তা কি তিনি জানেন না? আলবৎ জানেন।

প্রশ্ন করলেন খগেনবাবু: ব্যাপারটা শুনেছেন স্যর?

: কোন্ ব্যাপার?

: 'হরকরা' নাকি পতিতপাবনবাবুর শালাকে ফ্রণ্টে রিপোর্ট করতে পাঠাচ্ছে?

: কী বললে? কাকে পাঠিয়েছে? বুটলোকে? ঐ যে বখাটে ছোঁড়া। বাবরি চুল রাখে আর সিনেমায় 'য়্যাক্টো' করে। ও আবার রিপোর্ট করবে কী হে!

: ঐ তো সব চাইতে গোলমালের বিষয় স্যর! হয়তো ভুল করে দশটা গ্রাম দখল হয়েছে বলে 'ডেসপ্যাচ' পাঠাবে। সত্যিকারের রিপোর্টার হলে স্যর, ভয় পাবার কিছু ছিল না—খগেনবাবু মন্তব্য করেন।

: তাই তো হে, বড়ো ভাবনার বিষয়! কী করা যায় বলো দিকিনি? কথাটা সত্যিই চিন্তার বিষয়। ফতেনগরে একটা বিশেষ সংবাদদাতা পাঠানোর যে কতো ঝামেলা!

: আচ্ছা স্যর, একবার গুরুদেবের সঙ্গে পরামর্শ করলে হয় না? উনি হয়তো একটা উপায় বাৎলে দিতে পারেন।

: ঠিক বলেছো, চলো যাই।

ওরা দুজনে স্বামী জিবিদানন্দের বাড়িতে গেলেন।

* * *

ব্রজানন্দবাবুর মুখে সমস্ত কথা শুনে স্বামী জিবিদানন্দ ভাবলেন

যে, এটা স্বামী খলিলানন্দেরই কারসাজি। তাকে অপদস্থ করার জন্যেই হয়তো এই সব প্ল্যান করা হয়েছে। তবু হাসি মুখে বললেন : ব্রজ, ভয় পেয়ো না, ওরা লোক পাঠিয়েছে তো কী হয়েছে? আমি আছি কি জন্যে? রোজ সন্ধ্যায় আমি ধ্যানে বসে ফতেনগরের লড়াই'র প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী তোমায় বলে দেবো।

কথাটা শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হ'ন ব্রজানন্দবাবু। কিন্তু তবু তাঁর মনে শঙ্কা হয় যে 'হরকরা' হয়তো 'সমাচারে'র, আগেই লড়াই'র খবর ছেপে বসবে। তাই বলেন : কিন্তু 'হরকরা' যে আমার আগেই খবর পাবে গুরুদেব!

: পাগল হয়েছো? আপেক্ষিক তত্ত্ব কী জানো? ছাত্রাবস্থায় আমি তো ঐ নিয়েই রিসার্চ করতুম। এক দিন আইনস্টাইন বলে এক ছোঁড়া এসে তদ্বির করতে লাগলো, তার পর আমার গবেষণার কাগজগুলো ওর হাতে ছেড়ে দিলুম। এই থিয়োরি—আমারই কন্‌ট্রোলে। মানে আমি যে ভাবে বলবো সময় সেই ভাবেই চলবে। তুমি ভয় পেয়ো না ব্রজ, সব ঠিক হয়ে যাবে।

খুশি হয়েই ব্রজানন্দবাবু চলে যান। একটু বাদে স্বামী জিবিদানন্দ তাঁর চেলা বিপুলকে ডাকলেন। বললেন, বিপে, ধারাপুরের পোস্টমাস্টারকে চিনিস?

: একটু আধটু পরিচয় আছে বটে—

: বেশ, বেশ, এবার খাতিরটা জমিয়ে নাও। আর পারো তো আমার কাছে এক দিন নিয়ে এসো। আর বন্দোবস্ত করো, ডাকখানা থেকে 'হরকরা'র নামে যতো টেলিগ্রাম আসবে তারই এক কপি চাই। অন্ততঃ 'হরকরা'য় পৌঁছুবার দু' ঘণ্টা আগে। ধ্যানে বসে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী তো আমায় ব্রজকে দিতে হবে। তাই ঐ জিনিসটার বড়ো প্রয়োজন।

প্রভুর আদেশ নিয়ে বিপুল চলে গেলো।

*　　　*　　　*

শৈলর ফতেনগরের লড়াইতে রিপোর্টার হয়ে আসার এই হলো সংক্ষিপ্ত বিবরণী।

*　　　*　　　*

—চার—

দুপুর নাগাদ আমাদের গাড়ি এসে শ্যামগড় পৌঁছল। এখানে গাড়ি বদল করে ছোট লাইনে যেতে হবে বাণীপুরে। বাণীপুরের পাশের গ্রাম ফতেনগর।

সারাটা ট্রেন শৈলর সঙ্গে সংবাদপত্র নিয়ে বহু কথা হয়েছে। কথাবার্তায় বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, বহু দিন যাবৎ শৈল 'এ 'লাইনে' নেই। বিভিন্ন সংবাদপত্র ও রিপোর্টারদের কাহিনী শৈলকে বললাম। রিপোর্টিং সম্বন্ধে তার বিশেষ অভিজ্ঞতা নেই—রিপোর্টার-মহলে সে অপরিচিত। অতএব এ ক্ষেত্রে তার কাজ করার অসুবিধা হওয়া যে অবশ্যম্ভাবী এ তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম।

শৈল হেসে জবাব দিলে: আপনি আছেন তাহ'লে কি করতে দাদা!

আমি হেসে বলি: যা বলেছো ভায়া, 'নেভার মাইণ্ড', যা কিছু একটা করবো।

শ্যামগড় স্টেশনে আমাদের প্রায় তিন ঘণ্টা দেরি করতে হলো। আমি শৈলকে ডেকে বললাম: চলুন, রেস্তোরাতে বসে কিছু খেয়ে নে'য়া যাক।

: চলুন, শৈল উত্তর দেয়।

বয়কে ডেকে বেশ একটা লাঞ্চের অর্ডার দিলাম। তারপর শুরু হলো খোসগল্প। কবে কোথায় রিপোর্টিং করতে গিয়ে বিপদে পড়েছিলাম, কাকে ধোঁকা দিয়ে 'স্টোরি' আদায় করেছিলাম, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমাদের গল্প যখন বেশ জমে উঠেছে তখন হঠাৎ পেছন থেকে নিজের নাম শুনে বেশ চমকে উঠলাম।

: হেঁ, তুমি এখানে?

তাকিয়ে দেখি গিদোয়ানী।

গিদোয়ানী 'নতুন বার্তা' কাগজের প্রতিনিধি।

আমি হেসে উত্তর দিলাম : তুমিও তো এইখানে।

: মানে, আমরা তুজনে একই পথের পথিক। তাই না?

: ঠিক বলেছো। যাক্ গে, এর সাথে তোমার পরিচয় আছে? শৈল চৌধুরী, 'দৈনিক হরকরা'র রিপোর্টার।

: গ্ল্যাড টু মিট ইউ। দেখে মনে হচ্ছে এ লাইনে আনকোরা আমদানি। নেভার মাইণ্ড ব্রাদার, তু'দিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি যখন 'মর্নিং বুলেটিনে' প্রথম রিপোর্টার হয়ে ঢুকলুম, তখন বেশ নার্ভাস ছিলুম। তার পর দাদা, একবার যখন 'প্রফেশনের' সিক্রেট রপ্ত হয়ে গেলো, তখন আর কার তোয়াক্কা করি? হেঁ, হেঁ······বলেই গিদোয়ানী হাসতে লাগলো।

তার পর জিজ্ঞেস করলে : তার পর তোমরা কবে রওনা হলে?

: পরশু, তু'জনে প্রায় একই সঙ্গে জবাব দিই।

: ওয়েল ব্রাদার, আমার কথা আর বলো না। বিকেলে ডিউটিতে গিয়েছি, নিউজ-এডিটর ডেকে বললেন, গিদোয়ানী বিখ্যাত খেলোয়াড় কেবলরাম বিলেতে মারা গেছেন। ওর বউ আছে

এইখানে। এক্ষুণি কেবলরামের বাড়িতে চলে যাও, আর ওর বউর 'রিএ্যাক্‌শান' নিয়ে এসো। যদি সম্ভব হয় তো বউর একটা ছবিও নিয়ে আসবে। আমি তো ব্রাদার, অনেক খুঁজে বাড়ি বের করলুম। ওর বাড়ির অবস্থা দেখে তো আমি অবাক! কান্নাকাটি তো দূরের কথা, দেখলুম বাড়ির ভেতরে খুব হাসি-ঠাট্টা চলছে। ওয়েল, তোমরা জানো আমাদের এই প্রফেসন কি বিচিত্র ধরনের। মনের মধ্যে সন্দেহ পুষে রাখতে নেই। বাড়ির সামনে একটা চাকর ছিল, ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম : হেই, মিসেস বাড়ি আছেন? চাকরটা কি বুঝলো জানিনে। একটু বাদে এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। মধ্যম বর্ষিয়াই হবেন। বললুম : আমি 'নতুন বার্তা' কাগজের রিপোর্টার। মিঃ কেবলরামের মৃত্যু-খবর শুনে আমরা ভারি দুঃখিত হয়েছি। সমস্ত ক্রীড়া জগতের যে কী অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে সে আর কী বলবো। কিন্তু ওঁর মৃত্যু সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলতে হবে।

ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন : কেবলরাম কে?

আমি তো দাদা অবাক! মাত্র ছয় ঘণ্টা আগে খবর এসেছে, 'কেবলরাম ইজ ডেড', আর এর মধ্যেই কি না নিজের স্বামীকে ভুলে গেলেন ভদ্রমহিলা? ভাবলাম 'মডার্ন ওয়াইফ' হবে হয়তো। তাই বললুম : কেবলরাম! আই মীন, ইওর হ্যাজব্যাণ্ড কেবলরাম।

: আমার হ্যাজব্যাণ্ড, কেবলরাম! আপনি কি বলছেন? হোয়াট ডু ইউ মীন?

আমাদের দু'জনের কথাবার্তা শুনে এক বয়সী ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কী ব্যাপার?

আমি ভাই সব গুছিয়েই বললুম। আমার কথা শুনে ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা তো রেগে কাঁই। বললেন : ইয়ের্কি মারার জায়গা

পাওনি? আমার মেয়ের বিয়েই হয়নি, তার আবার হাজব্যাণ্ড। এক্ষুণি বেরোও আমার বাড়ি থেকে।

ওয়েল, তুমি জানো ব্রাদার। আমাদের জার্নালিজমে এ রকম অহরহ হয়েই থাকে। তাই চট্‌পট্‌ বেরিয়ে এসে বাড়ির নম্বরটা মেলালুম। না, বাড়ি ঠিকই আছে। তাহ'লে গলদ কোথায়? পাশের পানওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলুম। সে বললে: কেবলবাবু তো বহুত দিন হোল চোলিয়ে গেছেন। উন্‌হেকো বিবি ভী গিয়েছেন সাথ-সাথ। আভি তো নয়া তুসরা কেরায়াদার আ গিয়া।

বুঝলাম, ভুল বাড়িতে উঠেছিলাম। অবশ্য ঘাবড়াবার পাত্তর আমি নই। ভদ্রমহিলার ব্যবহারের প্রতিশোধ নিলুম। নিউজে লিখে দিলুম: 'কেবলরামের স্ত্রীর স্বামীর প্রতি অসন্তোষ ভাব।'

বলতে বলতে গিদোয়ানী থামলে। তারপর আবার বলতে শুরু করলে: সবে মাত্তর এই লিখে শেষ করেছি, নিউজ-এডিটর ডেকে বললেন: গিদোয়ানী প্যাক আপ ফর ফতেনগর। এক্ষুণি যেতে হবে।

আমি অবাক। জিজ্ঞেস করলুম: কী হয়েছে সেখানে?

নিউজ-এডিটর বললে: আরে সেইটে জানবার জন্যেই তো তোমায় পাঠাচ্ছি। প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজ সবাই লোক পাঠাচ্ছে। অতএব আমরা কাউকে না পাঠালে কর্তা আস্ত রাখবেন না।

ব্যস, তারপর ব্রাদার আমি এলাম এখানে।

এবার কণ্ঠস্বর একটু নামিয়ে গিদোয়ানী জিজ্ঞেস করলে: ব্যাপারখানা কি বলো দিকিনি দাদা! আমি তো এখন পর্যন্ত আসল ঘটনাটা কি জানতেই পারলুম না, তোমরা জানতে পারলে কিছু? গিদোয়ানী আমাদের প্রশ্ন করলে।

: কিস্সু না—আমরা জবাব দিই।

: মাইরি বলছো ?

: সত্যি।

একটু শুকনো হাসি হেসে গিদোয়ানী বলে : সাধে দাদা লোকে বলে জার্নালিজম সহজ ব্যাপার নয়। আমি আজ পনেরো বছর এ লাইনে আছি, প্রফেশনের হালটা এখনো পর্যন্ত বুঝতে পারলুম না।

আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে বললাম : ঠিক বলেছো ভায়া। জার্নালিজম ইজ টু কমপ্লেক্স থিং।

: হুররা···

পেছনে তাকিয়ে দেখি, ব্যারী ব্রুকসন ও রামগোপাল।

: বেয়োয়—ব্যারী ডাকলে।

বেয়োয় এলো। ব্যারী ও রামগোপাল লাঞ্চের অর্ডার দিলে। তারপর ব্যারী আমাদের দিকে তাকিয়ে বললে : ওয়েল, ওল্ড বার্ড, তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমরা সবাই এখানে। দি ওয়ার্ল্ড ইজ রাউণ্ড। কী বলো হে গিদোয়ানী ?

: পৃথিবী চ্যাপ্টা হলেও আমার কোন আপত্তি ছিল না।

: তার মানে তুমি আমাদের দেখে প্লীজড্ হওনি—ব্যারী বলে।

: ঠিক বলেছো। এই তেপান্তরে আবার যে তোমার সঙ্গে দেখা হবে, এ আমি আশা করিনি। তাই তো বলছিলুম যে, পৃথিবী গোল না হলে তোমাকে এড়াতে পারতুম—

গিদোয়ানীর কথা শুনে ব্যারী হাসতে থাকে। বলে : আমার অপরাধ ?

: অপরাধের কথা জিজ্ঞেস করছো ? মনে নেই সেই ডিসেম্বরের রাত্রিতে আমায় সিনেমার ভেতর রেখে ইন্টারভেলের সময় তুমি

বেরিয়ে গেলে, আর ফিরে এলে না। তারপর স্তর ভেঙ্কাচলমের কাছ থেকে 'এক্সক্লুজিভ ইণ্টারভিউ' আদায় করলে। অথচ সিনেমার টিকিট কাটার সময় আমায় বললে কি না, 'ব্রাদার গিদোয়ানী, উই আর অল ফর ওয়ান, এ্যাণ্ড ওয়ান ফর অল।' অথচ তোমার পেটে যে এতো শয়তানী বুদ্ধি ছিল এ কি আমি জানতুম।

ওদের হু'জনের কথা আমরা চুপ করে শুনছিলুম। রামগোপাল এবার মন্তব্য করলে। বললে: যা হবার তা হ'য়ে গেছে। এ নিয়ে মনে কোন খেদ রেখে লাভ নেই। তারপর আর কে-কে এলো ফতেনগরের লড়াই কভার করতে।

আমি শৈলর সঙ্গে ওদের পরিচয় করে দিলুম। ব্যারী বললে: আমরা তোমায় আমাদের দলে ওয়েলকাম করছি ব্রাদার। ব্যোয়, ব্রিং এ বটল অফ কোল্ড ওয়াটার।

তারপর কণ্ঠস্বর একটু নামিয়ে বললে: ভেরি স্যাড। এই সব রেলওয়ে স্টেশনে ড্রিংক পাওয়া যায় না। কাজেই ওর বদলে ঠাণ্ডা জল দিয়েই আমরা নতুন বন্ধুর স্বাস্থ্য পান করবো।

আমাদের গল্প যখন বেশ জমে উঠেছে তখন ঝড়ের বেগে একটি ছেলে ঘরে ঢুকলো। চুল তার এলো-মেলো—দাড়ি কামানো হয়নি বেশ কয়েকটা দিন।

: এই যে 'কমরেড' এসে গেছে দেখছি—ব্যারী বলে।

: 'কমরেড' নয় দাদা 'কমরেড' নয়। ও সব বুর্জোয়া উচ্চারণ আর করো না। ফরাসী ভাষায় এর উচ্চারণ হলো গিয়ে 'কামারাদ'। দাও একটা সিগ্রেট। খাকী মার্কা খেতে-খেতে মুখে অরুচি হয়ে গেছে। তোমাদের দে'য়া সিগ্রেট খেয়ে ক্যাপিটালিস্টের কিছু পয়সা ধ্বংস করি।

: না জাল কিশোরও নয়—

: তা হ'লে কে ? আমরা সবাই একসঙ্গে প্রশ্ন করি।

: দেশনেতা বাবুলাল সিং।

আমাদের মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠলো। সবাই যেন হতাশ হয়ে পড়লো ; আমি বললাম : উপায় নেই ব্রাদার। বাবুলাল সিং দেশ-বিখ্যাত নেতা। ওকে তুচ্ছ করা চলে না। উনি নিশ্চয় ফতেনগরের লড়াই সম্বন্ধে কিছু বলবেন। চলো, ওর কাছে যাওয়া যাক।

* * *

টু্যর শেষ করে বাবুলাল সিং বাড়ি ফিরছিলেন। নিজের কামরায় বসেছিলেন। সঙ্গে ছিল তাঁর সেক্রেটারি অনন্ত চাকলাদার।

বাইরে জনতার কোলাহল শুনে বাবুলাল সিং অনন্তকে ডেকে প্রশ্ন করলেন : অনন্ত, ওরা কারা ?

: এইখানকারই বাসিন্দা হবে স্যর ! আপনার দর্শন চায়।

: তুমি তো জানো অনন্ত, আমি বড্‌ডো ক্লান্ত। আর আমি যেখানে-সেখানে বক্তৃতা দিই নে। ওদের চলে যেতে বলো।

: স্যর, জনতার মধ্যে দু'চারজন প্রেস-রিপোর্টারকে দেখতে পেলাম। ওরাও আপনার কাছ থেকে বাণী শোনার জন্যে অপেক্ষা করছে।

: আই সী। তা হ'লে আমায় কিছু বলতেই হলো।—বাবুলাল সিং কম্পার্টমেন্টের হাতল ধরে এসে দাঁড়ালেন। চার দিক থেকে তুমুল জয়ধ্বনি উঠলো।

বাবুলাল সিং হাসলেন।

: আপনি কিছু বলুন—জনতা দাবি করলে।

: উনি বড্‌ডো ক্লান্ত—অনন্ত বলে।

: আমরা মানবো না। আমরা ওঁর বক্তৃতা শুনে যাবো।

এর পর আর উপেক্ষা করা চলে না। বাবুলাল বলতে রাজি হলেন।

কিন্তু কি বলবেন তিনি? দেশবাসীর সুখ-দুঃখের কথা বলতে গেলে তার মনটা বেদনায় ভরে আসে। বাবুলাল বলতে লাগলেন। কিন্তু একটু বাদেই স্পষ্ট বোঝা গেলো যে, জনতা বেশ উত্তেজিত হয়েছে। তাদের মধ্যে বেশ গোলমাল হচ্ছে। বাবুলাল থামলেন। জিজ্ঞেস করলেন: অনন্ত, ব্যাপার কি বলো তো? এরা উত্তেজিত কেন?

: স্যর বড্‌ডো ভুল হয়ে গেছে। আপনি যে বক্তৃতাটা দিচ্ছেন ওটা হলো ছয় নম্বর বক্তৃতা। রেলওয়ে ওয়ার্কার সম্বন্ধে; ওদের দাবি-দাওয়া নিয়ে। এরা সবাই ইস্কুল-কলেজের ছাত্র। আপনি সেই চার নম্বর বক্তৃতাটা দিন। গত বার রায়পুর স্কুলে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের সময় যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেইটে বলুন, দেখবেন জনতা শান্ত হয়ে গেছে।

বাবুলাল আবার বলতে লাগলেন।

: আপনারা ভাবছেন, আমি আপনাদের কাছে রেলওয়ে ওয়ার্কার সম্বন্ধে বলছি কেন? তবে শুনুন, আমার এই কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, আপনারা রেলওয়ে ওয়ার্কারের মতো ব্যবহার করবেন না। ছাত্রদাবির উপর জোর দিন…

চার দিক থেকে জয়ধ্বনি উঠলো।

* * *

কমরেড নিটস্কি বলে: লোকটা ঠগ।

রামগোপাল বলে: উপায় নেই দাদা! ওর বক্তৃতা আমায় কভার করতেই হবে। আমার কর্তার বিশেষ বন্ধু।

ব্যারী ব্রুকসন প্রশ্ন করলো: সত্যিই কি ব্যাটার ভবিষ্যৎ আছে?

উত্তর দিলে রামগোপাল : ভবিষ্যৎ মানে, আজ বাদে কাল এই ব্যাটাই দেখো একটা মন্ত্রী হবে।

: তা হ'লে তো দাদা একে উপেক্ষা করা চলে না। লণ্ডনে কিছুটা পাঠাতেই হবে দেখছি। কিন্তু ফতেনগর সম্বন্ধে একটা কথাও দেখি বললে না।

আমি জবাব দিই : এ সব রাজনৈতিক চাল আর কি। বলুক আর না বলুক বয়েই গেলো। আমি ভায়া লিখে দিচ্ছি : ফতেনগর সম্বন্ধে বাবুলাল সিংকে সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করলে পর দেশনেতা জবাব এড়িয়ে গেলেন এবং বললেন : 'নো কমেণ্টস্'।

: ঠিক বলেছো দাদা, ঠিক বলেছো। আমরা সবাই এই কথা লিখে দিচ্ছি—গিদোয়ানী উত্তর দেয়।

* * *

ফতেনগরে এসে যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় বিকেল চারটা। সেখানে দেখতে পেলাম বেশ সোরগোল পড়েছে। ভলাণ্টিয়ারের দল এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছে।

একজন ভলাণ্টিয়ার এসে জিজ্ঞেস করলে : প্রেস-রিপোর্টার ?

আমরা জবাব দিই : ইয়েস।

আমি বিদ্রোহী দলের ভলাণ্টিয়ার। আপনাদের জন্যে প্রেস-ক্যাম্প আমাদের হেড কোয়ার্টারের পাশেই তৈরি হয়েছে। শত্রু-দলের কেউ আছেন ?—ভলাণ্টিয়ার বলে।

: মানে—ব্যারী প্রশ্ন করে।

: মানে, আপনাদের মধ্যে এমন কোন কাগজের রিপোর্টার আছেন যাঁর কাগজের নীতি হলো আমাদের শত্রুপক্ষকে সমর্থন করা। অবশ্যি আপনারা যদি কেউ থাকেন তা হ'লে আমরা তাঁদের প্রেস-ক্যাম্পে জায়গা দিতে পারবো না ; 'হাই কম্যাণ্ডের' হুকুম।

ব্যারী রামগোপালকে প্রশ্ন করলে : এই, তোমাদের কি পলিসি ?

: রাইটিস্ট, কিন্তু এ ক্ষেত্রে লেফটিস্ট।

কমরেড নিটস্কি ফোড়ন কাটলে : মানে দাঁড়কাক।

: কমরেড নিটস্কি, ইয়ের্কি নয়। আমাদের পলিসি যাই হোক না কেন, আমাদের কাগজের সার্কুলেশন জানো। 'দি অনলি সার্কুলেটেড পেপার ইন দি কান্ট্রি।'

: থাক্, থাক্, ঝগড়া করে লাভ নেই। গিদোয়ানী, তোমার কি পলিসি ?

: আমরা লেফট-রাইট। মানে হাফ রাইটিস্ট হাফ লেফটিস্ট।

এমন সময় আর এক ভলান্টিয়ার ছুটে এলো। খবর দিলে : বিরোধী দলের ভলান্টিয়াররা আসছে, প্রেস-রিপোর্টারদের জন্যে। এদের শীগগিরই প্রেস-ক্যাম্পে নিয়ে যাও। আর দেরি নয়।

এবার প্রথম ভলান্টিয়ার বললো : চলুন দাদা, আমাদের ক্যাম্পেই চলুন। খাওয়া-দাওয়ার পর আপনাদের মধ্যে যাঁরা আমাদের নীতি সমর্থন করেন না, তাঁদের আমরা আমাদের নীতি বুঝিয়ে দেবো। চলুন আপনারা।

* * *

শৈল আমার দিকে এগিয়ে এলো। বললে : চলুন, এই ফতেনগরে থাকবার আর একটা জায়গা আছে। আমার দাদার বন্ধু, ডাক্তার মেটার।

আমি প্রায় লাফিয়ে উঠলাম। বললাম : আগে বলেননি তো ম'শাই! চলুন চুপি-চুপি এই ভিড় থেকে কেটে পড়ি। ওদের সঙ্গে থাকতে গেলে এক্সক্লুজিভ স্টোরি পাওয়া যাবে না। কখন কোন নিউজে আমাদের এরা ডুবিয়ে দেবে বলা যায় না।

: তা হ'লে চলুন। ডাঃ মেটারের বাড়িটা একটু খোঁজ করে নিতে হবে।

ব্যারীকে বললাম : আমরা দু'জনে ভাই অন্যত্র যাচ্ছি।

ভলান্টিয়ার প্রশ্ন করলে : তার মানে আপনারা আমাদের নীতিকে সমর্থন করেন না, এইতো ?

আমি একটু অপ্রস্তুত বোধ করলাম : নাঃ, নাঃ, পুরোমাত্রায় আমরা আপনাদের পক্ষে। তবে কি জানেন, শৈলবাবুর দাদার বন্ধু ডাঃ মেটার এইখানেই থাকেন। ওর ওখানেই আমরা ঠাঁই নেবো।

আমার কথা শুনে গিদোয়ানী এগিয়ে এলো। বললে : দাদা, আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো। ঐ ব্যারী ব্রুকসনকে বিশ্বাস নেই। ওখানে থাকলে আমার নিউজগুলোতে একটু 'কলার' দিয়ে ব্যাটা পাঠাবে এ আমি তোমায় হলপ করে বলছি।

আমি শৈলুর দিকে তাকালাম। শৈল বললে : বেশ তো চলুন। আমাদের সঙ্গেই থাকবেন।

ভলান্টিয়ার করুণ দৃষ্টি হানলে। কিছুতেই বিশ্বাস করতে রাজি নয় যে, আমরা বিরোধী দলের প্রেস-ক্যাম্পে যাচ্ছি নে। বললে : এক ঘণ্টা আমাদের নেতার সঙ্গে আলাপ করে দেখুন। আমি হলপ করে বলতে পারি যে, আপনারা আমাদের নীতির সমর্থক হবেন।

আমরা আশ্বাস দিলাম যে, আমরা তাদের নীতিরই সমর্থক অতএব এ বিষয়ে চিন্তা করবার কোন হেতু নেই। আমাদের থাকবার অন্যখানে সুবিধে আছে বলে আমরা যাচ্ছি।

* * *

সেদিন বিকেলে ফতেনগর বার এসোসিয়েশনে স্থানীয় সংবাদিকদের এক জরুরী সভা বসলো।

সভাপতির আসন নিলেন এক বৃদ্ধ উকিল। বহু কাগজের সঙ্গেই তিনি সংশ্লিষ্ট। সভায় এক প্রস্তাব পাস করা হলো। বলা হলো…

"আমরা স্থানীয় সাংবাদিকবৃন্দ বিদ্রোহী দলের ভলান্টিয়ারদের আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করছি। স্থানীয় সাংবাদিকদের ভলান্টিয়ারেরা যে ভাবে তুচ্ছ, অবহেলা করেছেন, সে নিতান্তই মর্মান্তিক, করুণ ও অসহ্য। বাইরের সাংবাদিক ও আমাদের মধ্যে যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে তার সুবিচার চাই। আমাদের জন্যে কোন সুব্যবস্থাই তাঁরা করেন নি। এ কি ঘোর অন্যায় নয়?"

সভায় ঠিক হলো, এই রেজল্যুশনের এক কপি দুই পক্ষেরই সুপ্রীম কমাণ্ডারের কাছে পাঠানো হবে।

—পাঁচ—

বেশ একটু কষ্ট করেই ডাক্তার মেটারের বাড়ি খুঁজে নিতে হলো।

ডাক্তার মেটার সাহেব নন। বাঙ্গালী। কি কারণে তিনি শহরের প্র্যাকটিস্ ছেড়ে এই নির্জন প্রান্তে আস্তানা গেড়েছেন, কেউ তা জানে না। তিনি ফতেনগরের বহু পুরাতন বাসিন্দা, সবারই পরিচিত।

একটা তিন তলা বাড়িতে থাকেন ডাঃ মেটার। ফ্ল্যাট হিসাবে বাড়িটা ভাগ করা। ফ্ল্যাটে ঢুকবার তিন-চারটে রাস্তা আছে। একটি রাস্তার সামনে আছে ডাক্তার মেটারের সাইন-বোর্ড। তীরের ফলা এঁকে রাস্তার নির্দেশ দে'য়া হয়েছে। তার নীচে লেখা, 'দিস ওয়ে ফর ডাঃ মেটার।'

আমরা পথের নির্দেশ দেখে বাড়ির ভেতর ঢুকলাম। একটু বাদে দেখতে পেলাম আর একটা সাইনবোর্ড। লেখা আছে: 'নাউ টার্ন রাইট ফর ডাঃ মেটার।' ইংরেজী অক্ষরের নিচে হিন্দীতে লেখা:

'ডাইনে মোড় নিজিয়ে।' অতএব আমাদের ডান দিকে আবার ঘুরতে হলো। একটু সামনে আর একটা সাইনবোর্ড। লেখা : 'গো স্ট্রেইট ফর ডাঃ মেটার।' সামনেই একটা সিঁড়ি। অতএব সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে হলো।

গিদোয়ানী বললে : ব্রাদার, এ দেখছি একেবারে ক্রসওয়ার্ড পাজলের ব্যাপার।

জবাব দেয় শৈল। বলে : রুগীরা যাতে একবার এপথে এলে আর না পালাতে পারে, তার সব বন্দোবস্তই করে রেখেছেন ডাক্তার সাহেব।

দোতালার কাছে এসে আর এক সাইনবোর্ড পেলাম। লেখা আছে : সামনের দিকে তাকান। ডাঃ মেটার নজদীগই আছেন।

সামনের দিকে তাকাই সত্যি, কিন্তু ডাঃ মেটারের পাত্তা নেই। একটু বাদে শৈল চিৎকার করে উঠলো। বললে : ডাক্তার সাহেবের আস্তানার হদিস্ পেয়েছি দাদা! এই যে এদিকে আসুন।

আমরা এগিয়ে গেলাম।

সিঁড়ির ঠিক ডান দিকেই দেখতে পেলাম, বেশ বড়ো রকমের একটা সাইনবোর্ড। লেখা আছে : 'ডাঃ মেটার—সেকেণ্ড ফ্লোর। বাড়িতে না পাইলে, বড় রাস্তার পাশে পানওয়ালার নিকট অনুসন্ধান করুন।'

সাইনবোর্ড দেখিয়ে শৈল আমায় জিজ্ঞেস করলে : দাদা, ডাক্তার সাহেবকে বাড়িতে পাবো তো?

আমি জবাব দিই : আগে চেষ্টা করেই দেখা যাক।

সাইনবোর্ডের পাশে একটা কলিং-বেল ছিল। গিদোয়ানী বেলটাতে জোরে টিপুনী দিলে। কিন্তু কোন সাড়া-শব্দ নেই। শৈল আমার মুখের পানে তাকালে।

আমি বললাম : 'ঘন্টা বাজিয়ে লাভ নেই। বরং কড়া-নাড়া দাও।'

শৈল কড়া-নাড়া দিলে। একটু বাদে ভেতর থেকে গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরে জবাব এলো : 'কে ?'

: 'ডাক্তার মেটার আছেন ?'

প্রায় পাঁচ মিনিট বাদে ডাক্তার-সাহেব বেরিয়ে এলেন। বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ হবে। গলায় 'স্টেথিস্‌কোপ'। মুখের ভাব দেখলেই বোঝা যায় যে, তিনি রুগী দেখতে ব্যস্ত ছিলেন।

ডাঃ মেটার জিজ্ঞেস করলেন : 'কী চাই ?'

জবাব দিলে শৈল। বললে : 'আমার নাম শৈল চৌধুরী। 'হরকরা' কাগজের রিপোর্টার। এরা আমার বন্ধু। 'ফতেনগরের লড়াই' রিপোর্ট করতে এ অঞ্চলে এসেছি। আমার দাদা বলেছিলেন—

শৈলর কথা শেষ হবার আগেই জবাব দিলেন ডাঃ মেটার। বললেন : 'আরে, আপনিই শৈল চৌধুরী ? আস্থন, আস্থন। হ্যাঁ, আপনার দাদার টেলিগ্রাম পেয়েছি। উনি আপনার আসবার কথা জানিয়ে আমায় গত কাল তার পাঠিয়েছেন। আপনার দাদা আমার বিশেষ বন্ধু—আই মীন ক্লাস ফ্রেণ্ড আর কি ?

তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন : 'ভেতরে আস্থন। লজ্জা করবেন না।'

আমরা ভেতরে গিয়ে বসলাম। বসবার ঘরটা কাঠের পার্টিশন দে'য়া। ঘরের অপর প্রান্তে রুগীদের চেম্বার। তুটো 'বেড' পাতা আছে। ঘরে ঢুকেই বুঝতে পারলাম যে, আমাদের অনুমান মিথ্যে নয়। কারণ সত্যিই ডাঃ মেটার রুগী দেখতে ব্যস্ত ছিলেন। রুগীদের চেম্বারের 'বেড' তুটোতে তখনও তুটি অল্পবয়সী ছেলে শুয়ে ছিল।

আমরা একটু অপ্রস্তুত বোধ করলাম। তাই আমি বললাম : 'সত্যি আপনাকে কাজের সময়ে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। আপনি রুগী দেখছিলেন—'

: 'রুগী! রুগী কোথায় দেখলেন আপনি? আরে মশাই, এই তেপান্তরের দেশে কি আর রুগী সেধে আসে? নেমন্তন্ন খাইয়ে 'পেসেন্ট' বানাতে হয়।'

এই কথা বলেই ডাঃ মেটার নিজের চেম্বারের বেডগুলোর দিকে তাকালেন। তারপর হেসে জবাব দিলেন : 'ওঃ আই সী'। আপনি ওদের কথা বলছেন তো? আরে ওরা যে আমার ভাই, ভাইপো। এই ভোঁদা ওঠ, আর শুয়ে থাকতে হবে না। ওঁদের মালপত্তরগুলো উপরে নিয়ে আয়।'

: 'ওরা রুগী নয়?'—গিদোয়ানী যেন বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করে।

: 'পাগল হয়েছেন। আসল কথা কি জানেন? আপনারা বন্ধু-মানুষ, আপনাদের সব খুলে বলছি। এই যে দুটি ছেলে দেখলেন, এর মধ্যে বড়ো ছেলেটি ভাই, ছোটটি ভাইপো। কেউ কড়া-নাড়া দিলে ওদের শুইয়ে রাখি। আই মীন, পেসেন্টের বেডে। কোন শালায় বলতে পারবে না যে, আমি বেকার ডাক্তার। আপনারা তো শহুরে লোক। জানেন তো জাঁকজমক দেখিয়ে কতো ডাক্তার রিয়েল ডাক্তার হয়ে গেলো। এই পাড়াগাঁ অঞ্চলে কোন বড়ো রকমের 'শো' না রাখলেও আমায় একটু লোক দেখাতে হয় আর কি! কী বলেন, প্ল্যানটা আমার কী রকম?'

: 'গ্র্যাণ্ড!'—আমি জবাব দিই। 'কিন্তু ডাক্তার-সাহেব, একটা কথার মানে তো বুঝতে পারলাম না?'

: 'কি?' সবিস্ময়ে ডাক্তার-সাহেব প্রশ্ন করলেন।

: 'ঐ যে আপনার দরজায় সাইনবোর্ডে লিখে রেখেছেন 'ডাঃ মেটার সেকেণ্ড ফ্লোর'—ঐ কথাটার মানে ঠিক বোধগম্য হলো না।'

: 'এটা আর কঠিন কী? মানে এই যে ধরুন দোতলার ফ্ল্যাটে বসে রুগী দেখছি, এটা রুগীদের জানা চাই তো। নইলে ওরা জানবে কি করে।'

: 'নাঃ, নাঃ, আমি সে কথা বলছিনে'—আমি বলি, 'আসল কথাটা কি জানেন? আপনি বসে রয়েছেন দোতলায়, অথচ সাইনবোর্ডে লিখে রেখেছেন 'সেকেণ্ড ফ্লোর'। ঐ 'সেকেণ্ড ফ্লোর' মানে তো তিন তলা। তাই বলছিলুম যে 'সেকেণ্ড ফ্লোর' কথাটার মানে কি রকম যেন বেখাপ্পা শোনাচ্ছে।'

: 'এ্যাঁ, বলেন কী মশায়! 'সেকেণ্ড ফ্লোর' মানে তিন তলা?' ডাক্তার মেটার লাফিয়ে উঠলেন। তারপর আবার বললেন: 'ঠিক বলেছেন দাদা। ঐ 'সেকেণ্ড ফ্লোর' তিন তলায়ই হবে, এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি। আমার মনেও একবার খট্‌কা লেগেছিল। আমি রোজই ভাবি, আমার পেসেণ্টগুলি যায় কোথায়। এবার স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, সব ব্যাটাই তিন তলা থেকে ভেগে যায়। উফ্, কী কেলেঙ্কারী কাণ্ড বলুন দেখি? এই ভোঁদা, শোন্ এদিকে। এক্ষুণি আমার সাইনবোর্ডটা সরিয়ে ফেল্। নইলে সব পেসেণ্ট ব্যাটা পগার পার হবে। সত্যি ব্রাদার, আপনি আমায় বাঁচালেন।'

* * *

বিকেল বেলা তার-অফিসে গিয়ে দেখতে পেলাম যে, গিদোয়ানীর দপ্তর তার পাঠিয়েছে: "Opposition displaying eye witness account stop Send colourful despatch adding local colour etpubreactions stop."

আমরা হাঁটতে হাঁটতে এক বড়ো মাঠের কাছে এসে পড়েছিলাম। আমার হাতে টেলিগ্রামটা দিয়ে গিদোয়ানী বললে : 'কি মুস্কিলে না পড়া গেলো, কী করি এখন ?'

শৈল বলে : 'এই তেপান্তরের নির্জন মাঠে কলারফুল স্টোরী সংগ্রহ করা কি চাট্টিখানি কথা !'

: 'না হে ব্রাদার, ঐ কলারফুল ডেসপ্যাচের জন্যে আমি ভাবছি নে। আমি ভাবছি, opposition-এর কথা। স্টোরীতে 'কলার' দিতে কতোক্ষণ। এই তো সেদিন দিমাপুরে বন্যা হলো। আমি গিয়েছিলুম রিপোর্ট করতে। উঃ, সে কী বিষ্টি রে বাবা ! দু' দিনেই নদী ফুলে-ফেঁপে উঠলো ! আর যায় কোথায় ! পাঠিয়ে দিলুম আমার স্টোরা। প্রবল বন্যা, দিমাপুর শহর ধ্বংস অনিবার্য। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার !'

: 'বলো কী গিদোয়ানী ! তুমিই সেই দিমাপুরের ফ্লাড স্টোরী পাঠিয়েছিলে ?'—আমি বলি।

: 'হরিবল' বলে শৈল। 'কিন্তু শহর ধ্বংস অনিবার্য এ কথাটা লিখলে কেন ?'

আমাদের কথা শুনে গিদোয়ানী হাসে, বলে : 'আরে, ঐ কথা যদি না লিখতুম তা হ'লে কি আর নিউজ হতো। নদী যখন আছে তখন বন্যা তো প্রতি বছরই হবে। এতে নতুনত্ব কোথায় ? কিন্তু 'শহর ধ্বংস অনিবার্য' লিখলুম বলেই তো 'বিগ ষ্টোরী' হয়ে গেলো। একেই বলে গিয়ে 'কলারফুল ডেসপ্যাচ'।'

: 'ঠিক বলেছো। এই হলো গিয়ে রিয়েল নিউজ। যা দৈনন্দিন ঘটছে, সে ঘটনা রিপোর্ট করে কী লাভ ! আমাদের কাজ হলো গিয়ে আসল ঘটনা থেকে স্টোরী বের করে নে'য়া।'—আমি জবাব দিই।

: 'হুম্', গম্ভীর হয়ে গিদোয়ানী জবাব দেয়। তারপর একটু বাদে বলে: 'সত্যি আমার ভয় হচ্ছে ঐ ব্যারী ব্রুকসনকে। ও-ব্যাটাকে বিশ্বেস নেই। ঐ হতভাগা যেখানেই গিয়েছে সেখানেই একটা কাণ্ড করেছে। ও যেখানেই থাক্ না কেন, আমি তোমায় জোর গলায় বলতে পারি, একটা কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে বসবে। তাই তো ওকে আমার ভয়। হয়তো ইতিমধ্যে ফতেনগরের লড়াই খতম হয়েছে বলে নিউজ পাঠিয়ে দিয়ে বসে আছে।'

গিদোয়ানীর কথাটা ভাববারই বটে। আমি ব্যারী ব্রুকসনকে জানি। ওকে নিয়ে একবার আমায়ও যথেষ্ট হাঙ্গামা পোহাতে হয়েছিল। আমার মনে হয় সেই হাঙ্গামার কথা।

একবার এক বিখ্যাত দেশনেতার মৃত্যু হয়। খবর শুনে সমস্ত দেশ গভীর শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ঠিক হলো যে মৃতদেহ প্রসেশন করে তাঁর জন্মস্থানে নিয়ে যাওয়া হবে। সেইখানেই মৃতদেহ দাহ হবে। আমি সেই মিছিলের সঙ্গে ছিলুম। ব্যারী ও রামগোপালও ছিল। প্রায় দুপুর দুটোর সময় আমরা দেশনেতার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে কান্নাকাটি হলো, তারপর ফুল-মালা-চন্দন আরও কতো কী! ঠিক হলো চারটের সময় মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে।

চারটে বাজে, কিন্তু মৃতদেহ নিয়ে যাবার কোন লক্ষণই দেখা গেলো না, রামগোপাল বাড়ির একজনকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে: 'কী ব্যাপার? বডি কখন নিয়ে যাওয়া হবে?'

লোকটা জবাব দিলে: 'আজ্ঞে দেশনেতার বড়ো ছেলের আসবার কথা আছে। উনি এলেই আমরা যাবো।'

পাঁচটা বেজে গেলো, তবু কারও উঠবার লক্ষণ নেই। অধৈর্য হয়ে রামগোপাল উঠে গেলো। বললে: 'দুত্তোর ছাই! বসে থাকতে থাকতে আমার হাত-পা ধরে গেছে। আমি চললুম।'

রাগ করে রামগোপাল চলে গেলো। এদিকে বিকেল ছ'টা বাজে, তবু অবস্থার কোন পরিবর্তন নেই। বাড়িতে তখনও পুরোদমে কান্নাকাটি চলছে। ব্যারী অতিষ্ঠ হয়ে পড়লো। সে বললে: 'ওহে ব্রাদার, আর নয়। রাত্রি হয়ে এলো। আই মাষ্ট গো।' ব্যারী চলে গেলো। আমি বসে রইলাম।

সাতটা—আটটা—নয়টা—বেজে যায়। তবু মৃতদেহ শ্মশান-ঘাটে নিয়ে যাবার কোন লক্ষণ নেই। দশটার সময় বাড়ির একজন এসে জানালে যে, দেশনেতার বড়ো ছেলের আজ আসবার কথা ছিল, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ তিনি এসে পৌছুতে পারেন নি। অতএব মৃতদেহ আগামীকাল শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে।

হতাশ হয়ে আমি বাড়ি চলে আসি। দপ্তরে খবর পাঠিয়ে দিই: 'মৃতদেহ কাল পোড়ানো হবে।'

পরদিন ভোরবেলা টেলিগ্রাফ-পিয়নের ডাকে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। আমার দপ্তর থেকে তার এসেছে। এ কী ব্যাপার! আমার দপ্তর কৈফিয়ৎ তলব করেছে। অর্থাৎ আমার স্টোরী ঠিক নয়। কারণ রামগোপালের কাগজ ছেপেছে 'বিরাট জয়ধ্বনির সঙ্গে অদ্য বিকেল পাঁচটার সময় এখানে মৃতদেহ সৎকার হয়।' ব্যারী লিখেছে: 'বিকেল ছ'টার সময় দেশনেতার মৃতদেহে অগ্নিসংযোগ করা হইলে পর সমবেত জনতা ক্রন্দন আরম্ভ করেন।' আর এদিকে আমি লিখেছি: 'মৃতদেহ আদৌ সৎকার হয় নি।'

সমস্ত ঘটনা জানিয়ে দপ্তর বলেছে যে, এই ভুল খবর প্রকাশ করার দরুন তারা দশের কাছে আর মুখ দেখাতে পাচ্ছেন না। অতএব আমার কৈফিয়ৎ তলব করা হয়েছে।

দপ্তরের টেলিগ্রাম পড়ে আমার চক্ষু স্থির। ব্যারী ব্রুকসনকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: 'এ কী ব্যাপার! 'বডিটা' যে এখনও শ্মশানে

নিয়ে যাওয়া হয় নি! আর তোমরা সবাই খবর দিয়েছো যে মৃতদেহ সৎকার হয়ে গেছে? আশ্চর্যি!'

রামগোপাল সামনে বসেছিল। হেসে প্রশ্ন করলে: 'আশ্চর্যের আবার কী হলো?'

: 'মানে মৃতদেহ সৎকার হয় নি, আর তোমরা সবাই কি না বলে দিলে, মৃতদেহ সৎকার হয়ে গেছে!' এবার জবাব দিলে ব্যারী। জিজ্ঞেস করলে: 'ব্রাদার, লোকটা মরেছে এ কথা ঠিক তো?'

আমি জবাব দিই: 'আলবাৎ মরেছে। নিজ চোখে দেখে এসেছি, এর মধ্যে ভুলটা কোথায়?'

আমার কথা শুনে ব্যারী হাসতে থাকে। বলে: 'তাহ'লে আমাদের ভুলটা কোথায়। লোক মরেছে যখন, তখন তার সৎকার আজ না হয় কাল হবেই। অতএব ওটা যদি কাল না হয়ে আজ হয় এতে আর ভুল কোথায়? মোদ্দা কথা একদিন না একদিন সৎকার হবেই। তাই নয় হে রামগোপাল, আমরা না হয় একদিন আগে দিয়েছি এই আর কি।'

ব্যারী ব্রুকসনের যুক্তি যে অকাট্য, এ কথা আমায় মানতেই হলো। কাজেই কোন কিছু বলবার উপায় নেই। এই পরাজয় আমায় হজম করতেই হবে।

আজ গিদোয়ানীর কথা শুনে আমার সেই সব পুরানো স্মৃতি মনে হতে লাগলো। তাই একটু চিন্তিত হয়ে বললুম: 'ঠিক বলেছো ভায়া! তোমার দপ্তরের তার দেখে মনে হচ্ছে ওদের বিশ্বেস নেই। চলো একটু প্রেস-ক্যাম্প ঘুরে আসা যাক। কী বলো শৈল?'

'দ্যাটস্ রাইট। ওদের উপর আমাদের নজর রাখা প্রয়োজন।' শৈল জবাব দেয়।

* * * *

প্রেস-ক্যাম্পে গিয়ে দেখলাম, রীতিমতো সোরগোল শুরু হয়ে গেছে। কমরেড নিটস্কিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

রামগোপাল বললে : 'আমি স্পষ্ট দেখলুম যে নিটস্কি টেলিগ্রাফ অফিসের দিকে যাচ্ছে।'

ব্যারী বলে : 'তার মানে তুমি কি বলতে চাচ্ছ, ও বেশ বড়ো রকমের 'নিউজ' পেয়েছে ?'

: 'নিশ্চয়ই'—বেশ জোর দিয়ে রামগোপাল বলে। 'আমি তোমায় কতো বার বলেছি ব্যারী। কমরেড নিটস্কিকে বিশ্বেস নেই। ওকে আমাদের চোখে-চোখে রাখা দরকার।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্যারী বলে : 'সে কথা কি আর আমি জানিনে ভাই! আলবাৎ জানি। তুমি, আমি যাই লিখিনে কেন, সরকার গ্রাহ্যিও করবে না, কিন্তু 'বুভুক্ষা' কাগজে আধা কলাম প্রকাশ হওয়া মানেই হৈ-রৈ কাণ্ড। কিন্তু লোকটা গেলো কোথায় বলো দিকিনি ?'

: 'টেলিগ্রাফ-অফিসে যায়নি এ আমি হলপ করেই বলতে পারি। কারণ আমরা তো এই মাত্র ওখান থেকে এলুম'—আমি জবাব দিই।

: 'তাহ'লে ?' সবাই প্রায় একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলো।

: 'নিশ্চয় কোন স্পেশাল ইন্টারভিউ নিচ্ছে'।—আমি বলি।

: 'কিন্তু কার কাছ থেকে নেবে বলো দিকিনি ? এখানে এসে যা অবস্থা দেখতে পাচ্ছি তাতে মনে হচ্ছে লড়াই তো দূরের কথা এমন কি কথা কাটা-কাটিও এ পর্যন্ত হয়নি।'—ব্যারী বলে।

: 'যা বলেছো দাদা! জায়গাটা দেখেই আমার মন খারাপ হয়ে গেছে।'—জবাব দেয় রামগোপাল।

: 'কিন্তু আমার দপ্তর কী বলছে জানো ? বলছে, আমায় ফ্রন্ট লাইনে যেতে।' গিদোয়ানী বললে।

: 'পাগল হয়েছ। 'ফ্রন্ট'ই নেই তার আবার লাইন।'—আমি উত্তর দিলাম।

: 'তা হ'লে কি করা যায় বলো তো?' শৈল প্রশ্ন করে।

: 'তাইতো ভাবছি। আমার মনে হয় ঐ কমরেড নিটস্কি নিশ্চয় ফ্রন্ট লাইনের হদিস পেয়েছে। ওখানে গিয়েছে হয়তো।'—মন্তব্য করলে রামগোপাল।

: 'ঠিক বলেছো ব্রাদার! হি মাস্ট হ্যাভ গন টু ফ্রন্ট লাইন।'—ব্যারী চিৎকার করেই বলে।

: 'কিন্তু হোয়ের ইজ ফ্রন্ট লাইন?'—আমি বলি।

: 'ইয়েস, হোয়ের ইজ ফ্রন্ট লাইন?'—সবাই একসঙ্গে প্রশ্ন করে।

: 'শোন, আমার মাথায় একটি আইডিয়া এসেছে।'—বললে রামগোপাল।

: 'কী?'— আমি প্রশ্ন করলাম।

: 'শোন, আমি বলছি, এই যুদ্ধ ভয়ানক এলোমেলো হচ্ছে অর্থাৎ Confused fighting.'

: 'ওঃ লর্ড!'—উত্তর দিলে ব্যারী ব্রুকসন।

: 'তার মানে তুমি বলতে চাও জোর লড়াই হচ্ছে?'

: 'আলবাৎ জোর লড়াই হচ্ছে। নইলে আমরা এখানে এসেছি কী করতে! আর বিদ্রোহী দল আমাদের জন্যে প্রেস-ক্যাম্পই বা তৈরী করবে কেন?'—রামগোপাল উত্তর দিলে।

: 'সত্যি রামগোপাল, আমার এ কথাটা একদম মনে হয়নি। তুমি ঠিকই বলেছো যে, জোর লড়াই হচ্ছে মানে Confused fighting। নইলে আমরা সব খবরই পেয়ে যেতাম এর মধ্যে। 'উই মাস্ট সেণ্ড এ গুড ডেসপ্যাচ।'—গিদোয়ানী বললে।

: 'তুমি কি ভেবেছো, আমি এখনও পাঠাইনি! ওয়েল, আমার স্টোরি ইতিমধ্যে হয়তো দপ্তরে পৌঁছে গেছে।'—রামগোপাল বললে।

: 'এঁ্যা, বলো কী? তুমি 'স্টোরি' ফাইল করে দিয়েছো! বাই জোভ! না হে, আর দেরি নয়। গিদোয়ানী, আমি তার-ঘরে চললুম। দেরী করলে দপ্তর থেকে বকুনি খেতে হবে,'—আমি রওনা হবার উপক্রম করি।

: 'চলো ব্রাদার, আমিও যাচ্ছি। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি Opposition displaying eyewitness account-এর মানে কী? ওয়েল লেট আস গো।' গিদোয়ানী উত্তর দিলে।

আমি, গিদোয়ানী, শৈল চলে এলাম।

—ছয়—

সুপ্রীম কম্যাণ্ডার অব দি ল্যাণ্ড, সী এ্যাণ্ড এয়ার ফোর্স অব দি ফতেনগর, ফিল্ড মার্শাল চুকন্দর সিং নিজের ঘরে বসে গোঁফ চুমরে নিচ্ছিলেন। ল্যাণ্ড ও এয়ারফোর্সের সুপ্রীম কম্যাণ্ডার মানে ফিল্ড মার্শাল চুকন্দর সিং জানেন, কিন্তু 'সী ফোর্সের' সুপ্রীম কম্যাণ্ডার কেন তাঁকে করা হয়েছে এটা তাঁর বোধগম্য হয়নি। কারণ তিনি জীবনে জল দেখেন নি।

আজ ভোরবেলা থেকেই কিন্তু মার্শাল চুকন্দর সিং গোঁফের যত্ন নিচ্ছিলেন। এই গোঁফের জন্য তিনি কতো কষ্টই না করেছেন। কতো অর্থ ব্যয় করেছেন, তবু কি না তাঁর সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হলো। কারণ গত বার দেশে যে গোঁফ-প্রতিযোগিতা হয়েছিল সে কম্পিটিশনে তাঁকে হারিয়ে ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল অব পুলিস জটাধর সিং প্রথম প্রাইজ পায়।

এ অসহ্য অপমান! একবার চুকন্দর ভেবেছিলেন যে, এর বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানাদিক ভেবে আর প্রতিবাদ করেন নি। কারণ এ কম্পিটিশনের জজ ছিলেন পল্লবিনী দেবী। ফলাফলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, আর পল্লবিনী দেবীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা একই কথা। পল্লবিনী দেবীকে রাগাতে চুকন্দরের সাহস নেই।

আজ চুকন্দরের মনটা ব্যাজার হবার আর একটা কারণ ছিল। কারণ গত কাল তিনি দেখতে পেয়েছেন যে, পল্লবিনী জটাধর সিং-এর সঙ্গে ঘোরাফেরা করছেন। এই মেলামেশার কী তাৎপর্য, এ কথা কি আর চুকন্দর জানেন না? কারণ এ দৃশ্য দেখেই এ বছরের গোঁফ-কম্পিটিশনের কি ফলাফল হবে এটা চুকন্দর অনুমান করে নিয়েছেন।

তবু এক বার শেষ চেষ্টা করে দেখবেন চুকন্দর। এ কথা ভাবতে ভাবতে ব্রেকফাস্ট টেবিলে এসে খেলেন। পাশেই দৈনিক সংবাদ-পত্রগুলো পড়ে আছে। সচরাচর তিনি খবরের কাগজ পড়েন না। যদি কোন বিশেষ খবর থাকে তাহ'লে তাঁর সেক্রেটারী পড়ে শোনান। শুধু মাত্র শনিবার দিন কাগজগুলোতে এক বার চোখ বুলিয়ে নেন। কারণ সেই দিন ফিল্ম-জগৎ সম্বন্ধে একটি পাতা বরাদ্দ থাকে। আজ শনিবার, তাই ব্রেকফাস্ট টেবিলে খবরের কাগজ পড়ে আছে।

একটা কাগজ খুললেন চুকন্দর, এ কী ব্যাপার! প্রথম পাতায় বড়ো বড়ো অক্ষরে এ কী লেখা আছে? 'ফতেনগরে লোমহর্ষক লড়াই!'

খবর পড়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন চুকন্দর। তারপর ঠোঁট কামড়াতে লাগলেন। তারপর আবার পড়লেন ব্যানার হেড লাইন। না;

কোন ভুল নেই—ফতেনগরে লোমহর্ষক লড়াই। এক বার নয়, দু' বার নয়, পর-পর পাঁচ বার খবরটা পড়লেন চুকন্দর। তারপর বানান করে ব্যানার হেড-লাইন পড়লেন।

অসম্ভব! এ খবর সত্যি হতে পারে না। তিনি হলেন ফতেনগরের সুপ্রীম কম্যাণ্ডার, আর দেশে এমনি একটা লড়াইর খবর তাঁকে জানানো হয়নি?

রাগে জ্বলতে থাকেন চুকন্দর। না, তাঁর সমস্ত কর্মচারীকেই বরখাস্ত করবেন। না, শুধু বরখাস্ত নয়, তিনি তাঁদের কোর্ট মার্শাল করবেন।

খাবার টেবিল ছেড়ে চুকন্দর নিজ দপ্তরে এলেন। তলব করলেন চীফ অব দি স্টাফ বন্‌বন্‌ চৌবেকে। চৌবেকে দেখে চুকন্দর উত্তেজিত হয়ে পড়েন। চুকন্দর খবরের কাগজ দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন: 'পড়েছেন আজকের কাগজ? ফতেনগরে লোমহর্ষক লড়াই। আমি হলুম গিয়ে প্রধান সেনাপতি অথচ এই আক্রমণের বিন্দুবিসর্গও আমায় জানানো হয়নি!'

ধমক খেয়ে বন্‌বন্‌ চৌবে জবাব দেয়: 'কাল স্তুর বাজারে একটা গুজব শুনেছিলাম বটে যে কয়েকটি ছোঁড়া মিলে ফতেনগর আক্রমণ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু খবরটা কনফার্মড্‌ হয়নি। ফ্রন্ট লাইনে তার পাঠিয়েছি সঠিক খবর জানবার জন্যে। এখন পর্যন্ত কোন জবাব পাইনি।'

জবাব শুনে চুকন্দর খুশী হয়েছেন কি না বোঝা গেলো না। তিনি বললেন: 'আপনি বলছেন ছোঁড়ারা আক্রমণ করবার চেষ্টা করছে আর এদিকে কাগজওয়ালারা লিখছে 'থ্রি প্রঙ্গ্‌ড্‌ য়্যাটাক।' না, আপনাদের বিশ্বাস করে লাভ নেই। হ্যাঁ, শুনুন আর দেরি করবেন না। আপনি ফতেনগরে এমার্জেন্সী ডিক্লেয়ার করে দিন। চার দিকে সৈন্য পাঠান—'

বন্‌বন্‌ চলে যাবার উপক্রম করলে। হঠাৎ চুকন্দর ডেকে বললেন 'শুনুন, আর একটা কথা আছে। ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল জটাধরকে জানিয়ে দিন যে, এমার্জেন্সী ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে আমি সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে নিচ্ছি—'

চৌবে যেন একটু ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করেন,—'স্যর, যদি অভয় দেন তাহ'লে একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

: 'বলুন, কী জানতে চান?'

: 'স্যর, কাগজওয়ালারা লিখেছে, 'থ্রি প্রঙ্গ্‌ড্‌ য়্যাটাক।' ঐ 'প্রঙ্গ্‌ড্‌' কথাটার মানে তো ঠিক বুঝলুম না!'

এবারে সত্যিই একটু চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন চুকন্দর। সত্যিই 'প্রঙ্গ্‌ড্‌' কথাটা মাত্র তিনি আজ কাগজে পড়লেন। এর আগে কখনও পড়েন নি। বিংশ শতাব্দীতে যুদ্ধ যে ক্রমেই জটিল হয়ে পড়ছে, এটা চুকন্দর যেন উপলব্ধি করতে পারলেন। কী এর মানে হতে পারে, ভাবতে থাকেন চুকন্দর। কাগজ পড়ে তাঁর একবার মনে হয়েছিল 'প্রঙ্গ্‌ড্‌' শব্দটির মানে জেনে নেবেন। ভেবেছিলেন চৌবেকে এই প্রশ্ন করবেন। কিন্তু নানা প্রশ্নের তাড়াহুড়ায় ও প্রশ্নটা আর জিজ্ঞেস করা হয়নি। চৌবেই এখন তাঁর কাছে জানতে চাইছে শব্দটির মানে কি।

'প্রঙ্গ্‌ড্‌', 'প্রঙ্গ্‌ড্‌', একটু ভাবনায় পড়েন চুকন্দর। তারপর জবাব দে'ন: 'ঠিক বলেছেন। এই সব মডার্ন ওয়ারের ব্যাপার। দিন দিন এগুলো ক্রমেই জটিল হয়ে পড়ছে। তাই বলি এ নিয়ে একটু টেকনিক্যাল এডভাইস নে'য়া প্রয়োজন। ডাকুন দেখি কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেলকে।'

কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল এলেন সত্য, কিন্তু 'প্রঙ্গ্‌ড্‌' কথার মানে তিনিও সঠিক বলতে পারলেন না। এর পরে এলেন, এ্যাড্‌জুটান্ট

জেনারেল, মেজর জেনারেল, লেফটেন্যান্ট জেনারেল, আরো সবাই, চুকন্দরের ঘর ভর্তি হয়ে গেলো কিন্তু 'প্রঙ্ ড্' কথা সবার কাছেই নতুন। সমস্ত ফতেনগর ফৌজে রীতিমতো সাড়া পড়ে গেলো।

একটু বাদে চুকন্দর চৌবেকে বললেন: 'শুনুন, 'মডার্ন ওয়ার' সম্বন্ধে যে বইগুলো কেনা হয়েছে, দেখুন তো ওতে কিছু পাওয়া যায় কি না!'

এতক্ষণে একটা ভালো প্ল্যান বাতলে দিয়ে চুকন্দর যেন মুক্তি পান। বই পড়লে বিংশ শতাব্দীর যুদ্ধ সম্বন্ধে হয়তো অনেক কিছু জানা যাবে।

এবার চৌবের ব'লবার পালা। একটু ভয়ার্ত কণ্ঠেই সে জবাব দেয়। বলে: 'স্যর, এবার তো যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন বই কেনা হয়নি। যে বইয়ের অর্ডার দিয়েছিলাম তা এখনও পাইনি।'

: 'পাইনি মানে?' সবিস্ময়ে চুকন্দর প্রশ্ন করলেন।

: 'আজ্ঞে, যা কিছু টাকা ছিল সে দিয়ে ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল জটাধর সিং ডিটেকটিভ থ্রিলার কিনেছেন। দেশে নাকি চুরি-ডাকাতি বাড়ছে। অতএব কর্মচারীদের এই সব বই পড়ার নাকি একান্ত প্রয়োজন।'—চৌবে বলে।

: 'আবার জটাধর'? রেগে কাঁই হয়ে উঠলেন চুকন্দর। জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই কি তাঁকে জটাধরের সঙ্গে লড়াই করতে হবে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে? কিন্তু কী করবেন তিনি? তিনি যে নিরুপায়! কে তাঁর কথা শোনে? কারণ জটাধরের সহায় হলো পল্লবিনী দেবী, তাঁর তুলনায় চুকন্দর তো নগণ্য কীট মাত্র।

: 'এখন তা হলে আমি কী করি? এ তো আর চোর-ডাকাত ধরা নয়। কোন জিনিসের মানে না বুঝে তো আর লড়াই করা যায় না! দেশরক্ষা তা হ'লে জটাধরই করুক। আমার আর কী কাজ!'

মুখে কথাটা বললেন সত্য, কিন্তু মনে-মনে শিউরে উঠলেন। চৌবের কাছে এ রকম বেফাঁস কথাটা বলা সমীচীন হয়নি। হয়তো ও এক্ষুণি জটাধরের কানে গিয়ে লাগাবে। আর একথা জটাধর জানতে পারলে কি তার প্রধান সেনাপতির পদটা থাকবে? বহু দিন ধরেই জটাধর প্রধান সেনাপতি হ'বার ফিকিরে আছে। এবার মৌকা বুঝে হয়তো কাজটা বাগিয়ে নেবে।

তারপর একটু বাদে বললেন: 'ঠিক আছে। আপনারা যে যার কাজ করুন গিয়ে। আমি দেখি এই 'প্রঙ্গ্‌ড্‌' কথাটার কোন মানে করতে পারি কি না।'

* * *

আধ ঘণ্টা বাদে চৌবে আবার চুকন্দরের ঘরে এলেন।

: 'কী ব্যাপার? কী হলো?'—চুকন্দর প্রশ্ন করেন।

: 'স্যর, ব্যাপারটা একটু গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ প্রান্তে বিরোধী দল এক জন মেজর জেনারেলকে পাঠিয়েছে। আমরা পাঠিয়েছি এক জন ব্রিগেডিয়ারকে।

: 'তাহ'লে গোলমালটা কোথায় শুনি?' চুকন্দর প্রশ্ন করেন।

: 'আজ্ঞে, আমাদের এক জন ব্রিগেডিয়ার পাঠানো ঠিক হবে না। হয়তো আইন-সভায় ও নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে যে মেজর-জেনারেলের বিরুদ্ধে ব্রিগেডিয়ার পাঠানো হলো কেন? লড়াইটা হওয়া চাই—সেয়ানে-সেয়ানে। অতএব বিরোধী দল যদি মেজর জেনারেল পাঠিয়ে থাকে, তা হ'লে আমাদেরও এক জন ঐ পর্যায়ের লোক পাঠান উচিত। লেফট্যানাণ্ট জেনারেল না হোক অন্তত মেজর জেনারেল পাঠানো উচিত।'

: 'কিন্তু কোথায় পাবো লেফট্যানাণ্ট জেনারেল শুনি? লোকের যা অভাব।'—চুকন্দর জবাব দিলেন।

: 'লোক যথেষ্ট আছে স্যর ! খালি প্রমোশান দিলেই হলো। ব্রিগেডিয়ার লুটেরা হুবেকে প্রমোশান দিলেই আমাদের সমস্ত ল্যাঠা চুকে যায়।'

: 'ঠিক বলেছেন, ব্রিগেডিয়ার লুটেরা হুবেকে প্রমোশান দিন। বানিয়ে দিন লেফট্যানাণ্ট জেনারেল। হ্যাঁ, ভালো কথা। শুনতে পেলুম সব কাগজের রিপোর্টারেরা না কি এখানে এসেছে ? আচ্ছা, ওদের কাছ থেকে ঐ 'প্রঙ্গ্ড্' কথাটার মানে একটু জেনে নিলে হয় না ?'

* * *

গভীর রাত !

রণাঙ্গন নিস্তব্ধ। চারদিকে ঘন আঁধার, কিছুই দেখা যায় না, কিছুই শোনা যায় না।

ট্রেঞ্চে বসে বসে ভোম্বল হাই তুলছিল, অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে কিন্তু মশার উপদ্রবে ঘুমোনো যায় না। ভোম্বল মশা তাড়াতে লাগলো।

ভোম্বলের একটু দূরে বসে ছিল গজানন। ভোম্বলের মশা তাড়াবার আওয়াজ শুনে তার ঘুম ভেঙে গেলো। ফিস্-ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলে : 'ভোম্বলা, কী করছিস্ ?'

: 'বড্ডো মশা, ঘুমুতে পারছিনে।'

: 'কী বলছিস ? শুনতে পাইনে যে !'

: 'বড্ডো মশা—'

: 'আরো জোরে বল।'

: 'মশা মানে 'মসকুইটো' এসেছে।'

: 'কি বললি, 'মসকুইটো' এসেছে ?'

: 'আলবাৎ, ওর আওয়াজে ঘুমুতে পাচ্ছিনে।'

: 'বাপ্‌স্‌! বলিস কী রে? মসকুইটো, গুড হেভেন্স!' গজাননের পাশের লোকটা তখনও ঘুমুচ্ছিলো। তাকে নাড়া দিয়ে ওঠালে গজানন। বললে: 'শুনছেন ম'শায়, 'মসকুইটো' এসেছে।'

: 'সেভা আবার কী?'—পাশের লোকটি জিজ্ঞেস করলেন।

: 'আরে ম'শায়, 'মসকুইটো'র নাম শোনেন নি? একদম নিউ টাইপ অব প্লেন। ওর আওয়াজে ভোম্বলের ঘুম হচ্ছে না।'

: 'কৈ, আমি তো কোন আওয়াজ পাচ্ছিনে?'

: 'পাবেন কোত্থেকে? আপনি যে কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমুচ্ছেন। লড়াই করতে এসেছেন না কচু।'

: 'দেখুন ম'শায়, মুখ সামলে কথা বলবেন। অপমান আমি সহ্য করবো না। আপনাদের এক্ষুণি মজা দেখিয়ে দিতে পারি।'

: 'কী করবেন শুনি?' গজানন বলে।

: 'বিরোধী দলে চলে যাবো।'— লোকটি উত্তর দেয়। কথাটা অতীব সত্যি। কারণ সেদিন ভোরবেলা সে বাজার করতে এসেছিল। এমনি সময় দেখলে এক বিরাট মিছিল যাচ্ছে। এক জনকে জিজ্ঞাসা করলে: 'ও ম'শায়, কী হচ্ছে?'

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন: 'হৈ-রৈ কাণ্ড। লড়াই!'

: 'কোথায় শুরু হলো?'

: 'আজ্ঞে সেইটে তো যাচাই করতে যাচ্ছি। আসবেন না কি?'

মিছিলের ভদ্রলোক তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। বাজার করা বন্ধ করে সে মিছিলে যোগ দিলে। এর পরে যে কী হলো, সেটা তার ঠিক মনে নেই। কারণ, মিছিল এসে থামলো এক বিরাট দালানের সামনে। ভদ্রলোক দেখতে পেলেন যে, বাড়ির সামনে বেশ জনতা দাঁড়িয়ে আছে। যাকে জিজ্ঞেস করে—'ব্যাপারটি কী'

সেই বলে 'লড়াই'। সমস্ত ব্যাপারটি বোঝবার আগেই একটা লোক এসে বললে : 'পরো।'

: 'কী জন্যে ?'

: 'লড়াই দেখতে যাবে না ?'

ব্যস্ আর কথা নেই। সে অম্লান বদনে পোশাকটা পরে নিলো। খাঁকি শার্ট-প্যান্ট। একটু বাদে একটা লোক এসে বন্দুক দিয়ে গেলো। বললে : 'খালি হাতে লড়াই দেখতে যাওয়া নিরাপদ নয়। তাই বন্দুকটা নিয়ে নাও।'

বন্দুক তাকে কাঁধে নিতে হলো। তারপর শহর ছাড়িয়ে যেই এসেছে অমনি সে শুনতে পেলো যে এক জন হুকুম দিচ্ছে,—'কুইক মার্চ।' সে পাশের লোকটার দিকে তাকালে। জিজ্ঞেস করলে : 'কী ব্যাপার দাদা ?'

: 'যুদ্ধ করতে এসেছেন, কি ব্যাপার তা জানেন না ?'

: 'আমি আবার যুদ্ধ করতে আসবো কেন। আমি এসেছি বাজার করতে।'—লোকটা জবাব দেয়।

: 'হেঁ-হেঁ চাঁদু, এখনও মজাটা বোঝনি। আমিও কি ছাই লড়াই করতে এসেছিলাম। এসেছিলাম দুধ কিনতে। লোকে বললে—লড়াই। ভাবলাম ষাঁড়ে-ষাঁড়ে বুঝি আবার মজা লেগেছে। মিছিলে যোগ দিলুম। একটু বাদে শুনি কি, এটা হলো 'সৈন্য রিক্রুটের' মিছিল।' যে লোকটা বাজার করতে এসেছিল, সে আর্তনাদ করে উঠলো। বললে : 'সে কী! আমি যে লড়াইর কিস্সু জানিনে।'

: 'পাগল, আমিই কী জানি!'

: 'তা হ'লে আমি বাড়ি চললুম।'

: 'দাদা, ব্যাপার যতো সহজ ভেবেছেন, ততো সহজ নয়। লড়াইর খাতায় নাম লিখিয়েছেন তো শ্মশানঘাট-অবধি যেতে হবে।'

: 'এঁ্যা, শ্মশানঘাটে যেতে হবে !'

: 'আলবাৎ। হাঁ, উপায় একটা আছে বটে। যেই সুবিধে পাবেন অমনি বিরোধী দলে যাবেন। ওদের আইন-কানুন অনেক শিথিল। আমাদের কাজ হলো লড়াই করা, সে যে দলেই হোক না। কী বলেন ?'

বলেই ভদ্রলোক হাসতে লাগলেন।

গজানন ও তার পাশের লোকের চিৎকার শুনে কর্পোরাল ছুটে এলেন। বললেন : 'এতো চ্যাচাচ্ছো কেন ? তোমাদের চিৎকার শুনে আমার ঘুম হচ্ছে না। কী ব্যাপার ?'

গজাননকে দেখিয়ে সৈন্যটি জবাব দিল : 'স্যর, এই লোকটা বলছে 'মসকুইটো' এসেছে।'

সৈন্যটির কথা লুফে নেয় গজানন। বলে : 'হ্যাঁ স্যর, এইমাত্র ভোম্বলা বললে যে, 'মসকুইটোর' উপদ্রবে ওর ঘুম হচ্ছে না।'

কর্পোরালের ঘুমের নেশা ছুটে গেলো। বললেন : 'বলো কী হে, 'মসকুইটো' !'

: 'হ্যাঁ স্যর ! ওর আওয়াজে তো ঘুমই হচ্ছে না কারো।'

: 'সিচুয়েশান সিরিয়স। না, ফিল্ড কম্যাণ্ডারকে জানাতে হচ্ছে।'

একটু বাদে ফিল্ড কম্যাণ্ডারের কাছে টেলিফোন গেলো যে, এক ঝাঁক 'মসকুইটো' এসেছে। ফিল্ড কম্যাণ্ডার ডিভিশনাল কম্যাণ্ডারকে জানালেন যে, শত্রুপক্ষ থেকে এক ঝাঁক 'মসকুইটো' বিমান 'রেড' করেছে।

ডিভিশনাল কম্যাণ্ডার জানালেন লুটেরা ডুবেকে যে, শত্রুপক্ষের নতুন টাইপের প্লেন 'মসকুইটো' আজ রাত্রে বোমা নিক্ষেপ করেছে।

লুটেরা তবে জানালেন বন্‌বন্‌ চৌবেকে যে, আজ শত্রুপক্ষের 'মসকুইটো' বিমান হানা দিয়েছিল। ক্ষতির পরিমাণ নিতান্তই সামান্য।

কিন্তু মার্শাল চুকন্দর ঘুমুচ্ছিলেন। এমনি সময় বন্‌বন্‌ চৌবে এসে ঘুম ভাঙ্গালেন; বললেন: 'স্যর, বিষম কাণ্ড!'

: 'আমার ঘুম ভাঙ্গালে কেন?' চুকন্দর হুমকি দিয়ে প্রশ্ন করলেন।

: 'সে কী স্যর? আপনিই তো বলেছিলেন যে, আপনাকে সব খবর জানাতে।'

: 'সে জন্যে কী মাঝ-রাত্রে ঘুম ভাঙ্গাবে? বেশ, শুনি কী হয়েছে!'

: 'স্যর, মসকুইটো'—

: 'সে আবার কে?'

: 'নতুন টাইপের প্লেন। শত্রুপক্ষের। আজ রাত্রে আমাদের শিবিরে হানা দিয়েছিল। ক্ষতি যৎকিঞ্চিৎ।'

: 'বলো কী হে বন্‌বন্‌? আমি ভেবেছিলুম—ব্যাপারটা সিরিয়স্‌ নয়। কিন্তু এখন দেখছি, বেশ গোলমেলে হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

: 'হ্যাঁ স্যর—নিতান্তই জটিল হয়ে পড়ছে।'

* * *

পরদিন সকালের কাগজে বড়ো বড়ো অক্ষরে ছাপা হয়ে গেলো—'ফতেনগরের লড়াই'র গুরুতর পরিস্থিতি। শত্রুপক্ষের আধুনিক বিমান 'মসকুইটোর' হানা। ক্ষতি সামান্য।'

এর পরে রইলো সংবাদপত্রের বিশেষ প্রতিনিধির প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ।

* * *

—সাত—

বিলাসিনী ডাঃ মেটারের বাড়ির ঝি। রান্না-বাজার সব কিছুই তাকে করতে হয়। কিন্তু আজ কয়েক দিনযাবৎ কাজে বিলাসিনীর মন বসছে না! মনটা উড়ু উড়ু করছে। কারণ, বিলাসিনী প্রেমে পড়েছে।

তার প্রেমাস্পদের নাম নবীন। নবীন বিলেত-ফেরৎ; কারণ গত মহাযুদ্ধে সে সেপাই হয়ে বিলেত গিয়েছিল। অতএব বিলাসিনীর গর্ব করার যোগ্য কারণ ছিল। এ অঞ্চলে ঝি-মহলে কারো প্রেমাস্পদই বিলেত-ফেরৎ নয়।

নবীন সম্প্রতি হালে প্রেস-ক্যাম্পে কাজ নিয়েছে। রান্না-বাজার সব কিছু তাকেই করতে হয়।

নবীন জানে, বিলাসিনীর কিছু সঞ্চিত টাকা আছে। তার দৃষ্টি রয়েছে সেই অর্থের উপর। বহু দিন সে শহরে ঘোড়-দৌড়ের মাঠ দেখেনি। না দেখবার কারণ, শহরে তার প্রচুর দেনা হয়েছিল এবং লোকালয়ে মুখ দেখানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই ভাবছিল, কি করে টাকা সংগ্রহ করে সে আবার সভ্য-সমাজে ফিরে আসতে পারে। বিলাসিনীর সঞ্চিত অর্থের কথা সে লোক-পরম্পরায় শুনতে পেয়েছে। তাই ভাবছে কি করে এই টাকার কিছু অংশ আদায় করা যায়।

বিলাসিনীকে নবীন তার মতলব জানায় নি। কারণ, তা হ'লে এই প্রেমে ভাঙন ধরবার সম্ভাবনা আছে।

আজ বিলাসিনী ঠিক করেছে যে, নবীনের কাছ থেকে একটা পাকা কথা নেবে। নবীন ঠিক করেছে যে, এই ভাবে আর বাকিতে প্রেম করা ঠিক হবে না।

রেল-স্টেশনের ধারে পুকুরের পাড়ে তাদের দেখা হলো। বিলাসিনী বলে: 'কী চমৎকার আকাশ! বড়ো চাঁদ উঠেছে।'

নবীন টাকার কথাই ভাবছে খালি। সে অন্যমনস্ক হয়েই জবাব দেয় : 'আলবাৎ! চাঁদটা দেখতে কিন্তু অনেকটা নতুন টাকার মতো।'

নবীনের জবাব শুনে বিলাসিনী একটু বিস্মিত হয়। এ তো ঠিক প্রেমের লক্ষণ নয়!

বিলাসিনী বলে : 'আর কাজ-কর্মে মন বসছে না।'

নবীন জবাব দেয় : 'কাজে মন বসা কী আর চাট্টিখানি কথা! আগে বাজার থেকে কিছু মুনাফা থাকতো। আজ-কাল যা কিছু পাই, তা বাবুরা আবার ধার নিতে আরম্ভ করেছেন।'

বিলাসিনী যেন বিষম খেলো। তারপর আরো খানিকক্ষণ চুপ-চাপ। এবার বিলাসিনী বললে : 'মনে হচ্ছে এটা বসন্ত কাল।'

এ কথা নবীন মানতে রাজী নয়। কাল সে বন্ধুর কাছ থেকে চিঠি পেয়েছে যে 'মনসুন সীজ্ন্' আরম্ভ হয়-হয়। 'ফরগেট-মী নট'এর এবার বাজি জেতবার কথা। তাই সে বিলাসিনীর কথার প্রতিবাদ করলে। বললে : 'না, না, এটা মনসুন সীজ্ন্।'

ইংরাজী বিলাসিনী বোঝে না। কিন্তু নবীন যখন ইংরাজী বলে তখন তার গর্ব হয়। কারণ, নবীন যে বিলেত-ফেরৎ। তাই সে কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলে : 'সে আবার কী?'

প্রশ্নটা শুনে নবীন একটু হতভম্ব হয়ে গেলো। বিলাসিনী যে সব কথারই মানে জানতে চাইবে, এটা সে কল্পনা করে নি। সে তার রেসকোর্সের কাহিনী বিলাসিনীকে জানাতে প্রস্তুত নয়। তাই সে থতমত খেয়ে জবাব দিলে : 'মনসুন সীজ্ন্ মানে বর্ষা আর কি।'

বিলাসিনীর সত্যি এবার চোখে বর্ষা এলো। কতক্ষণ ধরে সে লোকটার সঙ্গে প্রেম জমাতে চাইছে, কিন্তু কিছুতেই নবীন তার কথা শুনছে না। আশ্চর্য! পুরুষমানুষগুলো এই রকমই হয়! এমনি ভাবে তাদের আরো দু'ঘণ্টা প্রেমালাপ চললো, কিন্তু আলাপ

জমলো না। কারণ, দু' ঘণ্টা বাদে তারা স্পষ্ট বুঝতে পারলে যে, এটা বসন্তও নয়, মনসুনও নয়, ঘোর শীত। এ সময়ে বরফ জমতে পারে, কিন্তু প্রেম জমানো দুরূহ ব্যাপার!

*   *   *

রাত সাড়ে আটটার সময় প্রেস-ক্যাম্পে তুমুল হৈ-চৈ। খিদেয় সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এখনও পর্যন্ত রান্না হয় নি। এমনি সময় ভৃত্য নবীন এসে উপস্থিত। তার মনটা ভালো নেই, কারণ বিলাসিনীর কাছ থেকে সে টাকা আদায় করবার ফিকিরে ছিল, কিন্তু টাকা পায় নি।

রামগোপাল চিৎকার করে বললেঃ 'খাবার নিয়ে এসো নবীন!'

গম্ভীর কণ্ঠেই নবীন জবাব দেয়: 'রান্না হয় নি।'

ব্যারী ব্রুকসন জিজ্ঞেস করে: 'হোয়াট ইজ দি ম্যাটার?'

: 'নো কুকিং, নো ফুড'।—কমরেড নিটস্কি জবাব দেয়।

: 'আমি কারণ জানতে চাই, রান্না এখন অবধি হয় নি কেন?'

—রামগোপাল প্রশ্ন করে।

: 'ইয়েস, হোয়াট ইজ দি রিজন্?'—ব্যারী বলে।

এবার কমরেড নিটস্কির বলবার পালা। বলে: 'উঁহু, এ ভাবে প্রশ্ন করলে চলবে না। তোমরা ক্যাপিট্যালিস্ট ক্লাস। মজদুরদের সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয় জানো না।—ওয়েল, কামারাদ নবীন—'

: 'আজ্ঞে, বলুন'।—নবীন উত্তর দেয়।

: 'আজ্ঞে নয়, বলো 'কামারাদ'।'

নবীন একটু ইতস্তত বোধ করে। কমরেড নিটস্কি বলে: 'হুম্, বুঝতে পেরেছি, ধনিক-শ্রেণী তোমাদের মন ভেঙ্গে দিয়েছে।

তাই তোমরা জবাব দিতে পারছো না। ওয়েল, নেভার মাইণ্ড—কামারাদ নবীন, এখন পর্যন্ত রান্না হয় নি কেন?'

এবার নবীনের বলবার পালা। বলে: 'রান্না করবো কোত্থেকে? বাজারে কি লড়াই'র জন্য আর কোন জিনিস পাবার যো আছে! সব কিছু আক্রা হয়ে গেছে। না আছে চাল—না আছে তরকারি।'

সবিস্ময়ে রামগোপাল প্রশ্ন করে: 'বলো কী? এ যে দেখছি একদম 'ফুড ক্রাইসিস'।'

ব্যারী বলে: 'ফুড ক্রাইসিস! গুড লর্ড!'

: 'হবে না, এই ধনী পুঁজিবাদীদের জন্যে দেশ শ্মশান হয়ে গেলো। কী ভয়ানক ব্যাপার বলো তো!'—কমরেড নিটস্কি বলে।

: 'ভেরী সিরিয়াস।'—ব্যারী উত্তর দেয়।

: 'আলবাৎ সিরিয়াস। উই মাস্ট প্রটেস্ট'—রামগোপাল বলে।

: 'নো প্রটেস্ট রামগোপাল। তার চাইতে এই 'ফুড ক্রাইসিস-এর পূর্ণ বিবরণী আমরা কাগজে পাঠাব।'—নিটস্কি বললো।

: 'ভ্যাট্‌স রাইট। নো ডিলে।'

তিন জনেই তাদের টাইপরাইটার নিয়ে বসে গেলো।

* * *

: 'ওঃ দাদা, খিদেয় যে প্রাণ বেরিয়ে যায়।'—বিছানায় গড়াতে গড়াতে শৈল বলে।

: 'হ্যাঁ ভাই, খিদের জ্বালা, বিষম জ্বালা।'—আমি জবাব দিই।

: 'একটা উপায় বাৎলাও ব্রাদার! আর কতক্ষণ অনাহারে থাকা যায়?'—করুণ কণ্ঠস্বর নিয়ে গিদোয়ানী বলে।

রাত্রি আটটা বেজে গেছে। বিলাসিনীর দেখা নেই। আমাদের রান্না হয় নি। বাইরে বসবার ঘরে বসে ডাঃ মেটার তর্জন-গর্জন করছেন।

এমনি সময় বিলাসিনী এসে উপস্থিত। প্রায় চিৎকার করেই ডাঃ মেটার জিজ্ঞেস করলেন—'ব্যাপারখানা কী বিলাসিনী? রাত আটটা বেজে গেছে, এখনও রান্না হয় নি?'

বেশ নির্লিপ্ত কণ্ঠেই বিলাসিনী বলে: 'কী রান্না করবো? ভাঁড়ারে কি কিছু আছে, যে রান্না করবো?

: 'ভাঁড়ার খালি না হয় বুঝলুম, কিন্তু বাজার তো শূন্য নয়।'—ডাঃ মেটার কণ্ঠস্বরকে নামিয়ে বলেন।

: 'ও মা, এ কী কথা বলছে গো! জানো না বুঝি, আজ তিন দিন যাবৎ বাজারের জিনিস-পত্রের কি রকম দাম চড়ে গেছে। কোন কিছু কেনবার যো নেই।'—বিলাসিনী উত্তর দেয়।

এবার এই বাদানুবাদে আমরা যোগ দিই। শৈল প্রশ্ন করে: 'বিলাসিনী, বাজারের জিনিস-পত্রের দাম বাড়লো কী জন্যে?'

: 'বাড়বে না তো কী! ঐ যে তোমরা বসে বসে লড়াই'র সব ছাই-ভস্ম লিখছো, ঐ সব খবর আলুওয়ালা, পটলওয়ালা, পানওয়ালা সবাই পড়ছে আর জিনিস-পত্রের দাম বাড়াচ্ছে। ও মিনসেরা কম শয়তান নয়! বলে, লড়াই লেগেছে, আমরা কী করবো?'

এবার আমি বলি: 'তার মানে বিলাসিনী তুমি বলতে চাও, এই লড়াই'র জন্যে জিনিস-পত্তর সব কালোবাজারী হচ্ছে। অর্থাৎ, দুর্ভিক্ষ হয়েছে?'

: 'হয় নি, তবে হ'তে কতোক্ষণ।'—বিলাসিনী জবাব দেয়।

: 'বিলাসিনী ঠিকই বলেছে দাদা। দুর্ভিক্ষ এখনও হয় নি, কিন্তু হ'তে কতোক্ষণ।'—শৈল উত্তর দেয়।

: 'হুট্‌স রাইট। হ'তে কতোক্ষণ। আমার মনে হয় কি জনসাধারণকে সতর্ক করে দেয়া প্রয়োজন যে, এবার দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী।'

: 'ঠিক বলেছো'—। আমি সায় দিয়ে বলি।

: 'এ নিয়ে আমাদের একটা বড়ো স্টোরি পাঠানো দরকার।'

: 'যা বলেছো ভায়া'। শৈল বলে।

* * *

তার-ঘরের কাছে ব্যারী ক্রুকশন ও রামগোপালের সঙ্গে দেখা।

ব্যারী জিজ্ঞেস করে: 'হ্যালো, গিদোয়ানী কী খবর? এ দিকে যে, কী মতলব করে?'

: 'আর বলো কেন? ঘরে বসে থাকতে থাকতে মাথা ধরে গিয়েছিল। তাই একটু হাওয়া খেতে এসেছিলুম।'

: 'এই মাঝ রাত্তিরে?'—ব্যারী প্রশ্ন করে।

ব্যারীর এই প্রশ্ন যে গিদোয়ানীর মনঃপুত হয়নি এ তার জবাব শুনে বোঝা গেলো। বললে: 'রাত ন'টা কি মাঝ রাত্রি না কি হে?'

: 'আই সী'।—ব্যারী জবাব দেয়।

* * *

ব্যারী ও রামগোপাল চলে যাবার পর গিদোয়ানী আমায় বললে: 'ব্যাটার মতলবটা দেখলে তো। আমার কাছ থেকে খবরটা বের করে নেবার ফিকিরে ছিল। কী ঘুঘু রে বাবা!'

আমি একটু গম্ভীর হয়ে বলি: 'আচ্ছা, ওরা দুটো এদিকে এসেছিল কেন বলতে পারো? আমার মনে হয় কি জানো? কোন কিছু হয়তো ঘটেছে।'

শৈল ও গিদোয়ানীর মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। বলে: 'সত্যি বলছো?'

: 'সত্যি বলছি।'

* * *

ব্যারী রামগোপালকে বললে: 'গিদোয়ানীর মতলব কিন্তু ভালো নয় রামগোপাল।'

: 'কেন, ও আবার কী করলে ?'

: 'এই রাত্রিতে টেলিগ্রাফ দপ্তরের চার পাশে ঘোরা-ফেরা কিন্তু সুবিধের লক্ষণ নয়।'

: 'তার মানে ?'—রামগোপাল জিজ্ঞেস করে।

: 'সামথিং ইজ হ্যাপেনিং'—

*　　　　*　　　　*

প্রেস-ক্যাম্পের বারান্দায় বসে তখনও কমরেড নিটস্কি লিখে যাচ্ছে : এই চোরাবাজারী বন্ধ করতে হবে। বন্ধ করতে হবে মুনাফাখোর ব্যবসাদারদের স্টীম-রোলার। আজ এই শহরতলীতে ঘনিয়ে আসছে দুর্ভিক্ষের কঙ্কাল মূর্তি। ঘরে-ঘরে উঠছে হাহাকার, শিশুর ক্রন্দন—শ্রমিকের কাতর.........

*　　　　*　　　　*

পরদিন আইন-সভার সামনে তুমুল হৈ-চৈ। রাস্তায় বিরাট জনতা।

একটা বিক্ষোভকারীদের মিছিল বেরিয়েছে।

'কালোবাজারী বন্ধ করতে হবে', 'দু'মুঠো চাল সবাইকে দিতে হবে' 'দুর্ভিক্ষকে রুখতে হবে,' স্লোগান দিতে দিতে বিক্ষোভকারীরা আইন-সভার সামনে ভিড় করে দাঁড়ালো। বিক্ষোভকারীদের এক জন গান ধরলে। এই গানের প্রথম পদটি স্প্যানিস-গানের সুরে, শেষ পদটি নিখুঁত ভাটিয়ালী।

: 'এই কালো বাজারে—

মরছে হাজারে,

মোদের অন্ন নেই,

বস্ত্র নেই,—

জুলুম করা চলবে না, চলবে না।'

শেষের লাইনটি সমস্ত জনতা একসঙ্গে গাইলে।

তার পর প্রসেশনের এক প্রান্ত থেকে স্লোগান উঠলো। 'কালোবাজারী বন্ধ করতে হবে, দুর্ভিক্ষকে রুখতে হবে।'

প্রসেশনের অন্য প্রান্তে তখনও গান চলছে :

'হাতে হাত মিলিয়ে

শ্রমিকদের ভুলিয়ে

মুনাফা করা চলবে না, চলবে না।'

আবার স্লোগান ওঠে : 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' 'দুর্ভিক্ষকে রুখতে হবে।'

এমনি ভাবে প্রায় একটানা তিন ঘণ্টা চললো। এমনি সময়ে বিক্ষোভকারীদের এক স্বেচ্ছাসেবক তাদের নেতার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো। বললে : 'স্যর, এতক্ষণ ধরে চ্যাঁচাচ্ছি, কিন্তু কিছুতেই যে কিছু হলো না। পুলিশগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। খালি মজা দেখছে, একটা কথাও বলছে না!'

: 'আহা, একটু সবুর করো না। দেখবে কী হয়।'—নেতা জবাব দেন।

: 'না স্যর, আর পারছিনে'—স্বেচ্ছাসেবক বললে : 'আপনি বলেছিলেন তিন ঘণ্টা স্লোগান দিতে হবে, তিন টাকা করে দেবেন। চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে গলা ভেঙ্গে গেলো। তিন টাকা থেকে দেড় টাকা 'পেপ্‌স' কিনতে বেরিয়ে যাবে। বাড়ি থেকে এখান অবধি বাস ভাড়া ট্রেন ভাড়া হলো বারো আনা; আর থাকে বারো আনা। এতো অল্প পয়সায় আর চ্যাঁচাতে পারব না, স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।'

: 'তর্ক করো না। যাও স্লোগান দাওগে।'—নেতা বললেন।

: 'না স্যর, আমি চললুম'—। স্বেচ্ছাসেবক যাবার উপক্রম করে।

এমনি সময়ে একটি জীপ গাড়ি এলো। ড্রাইভারের পাশে এক জন দেশনেতা বসে আছেন।

চার দিক থেকে ধ্বনি উঠলো : 'শেম্' ! 'শেম্' ! বিক্ষোভকারীদের নেতা ছুটে জীপ গাড়ির কাছে এগিয়ে গেল। তার পর একটু বাদে জনতার কাছে এসে বললে : 'শেম নয়, ইনক্লাব জিন্দাবাদ দিন। উনি আমাদেরই।' অমনি চারদিক থেকে চিৎকার উঠলো : 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ !'

* * *

আইন-সভার সামনে দাঁড়িয়ে বিরোধীদলের নেতা খুব জোর বক্তৃতা দিচ্ছেন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছেন দুই-এক জন সরকারের সমর্থনকারী। নেতা বলছেন : 'আমরা সরকারের এই অকর্মণ্যতার আশু সমাপ্তি চাই। আমরা জানতে চাই, সরকার এই কালোবাজারী বন্ধ করার কী করেছেন ? এই যে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস এগিয়ে আসছে—হাজার হাজার ভুখা বস্ত্রহীন নর-নারী এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের জন্য সরকার কী করেছেন ? দেশে চালের দাম কতো হয়েছে, এ খবর সরকার রাখেন কী ? তাঁরা কি জানেন যে, কেন চাল পাওয়া যাচ্ছে না ? গত কাল রাত্রে চালের অভাবে আমাকে রুটি খেতে হয়েছে, এ খবর আমি আজ সকালে খাদ্য-মন্ত্রীকে জানিয়েছি।' সরকারের সমর্থনকারীদের একজন বলে উঠলো : 'মোটেই না। গত রাত্রে আপনি তো আমার বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়েছিলেন। আমার মেয়ের অন্নপ্রাশন ছিল।'

বিরোধীদলের নেতা বললেন : 'তা হ'লে নিশ্চয় পরশু রাত্রে আমি চাল পাইনি।'

: 'মোটেই না। পরশু দিন আপনি লাট-ভবনে খানা খেয়েছিলেন। আমি কাগজে দেখেছি।'—আর একজন সরকার-সমর্থনকারী বললেন।

এবার বিরোধীদলের নেতা ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। বললেন: 'বার বার আমার বক্তৃতায় বাধা আমি শুনতে চাইনে। আমি যখন বলেছি যে, আমি চাল পাই নি, তখন নিশ্চয়ই পাই নি। নইলে আমি কেন বলবো—'

এমনি সময়ে সেই জায়গায় খাদ্য-মন্ত্রীকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এলেন। ভিড় দেখে খাদ্য-মন্ত্রীকে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন: 'ব্যাপারটা কী হে? লোকটা বলছে কী?'

খাদ্য-মন্ত্রী জবাব দেন: 'উনি 'ফুড প্রব্লেমের' উপরে বক্তৃতা দিচ্ছেন।'

প্রধানমন্ত্রী হেসে বললেন: 'বলো কী হে! আমি তো ভেবেছিলুম যে, আমাদের সমস্ত 'প্রব্লেমই' সমাধান হয়ে গেছে।'

খাদ্য-মন্ত্রী হাসেন। বলেন: 'আমিও তো তাই জানতুম স্যর। কিন্তু আজকের কাগজগুলিতে খাদ্য-সমস্যা নিয়ে খুব জোর লিখেছে। বলেছে—আমাদের খাদ্য-পরিস্থিতি না কি খুবই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ঐ ফতেনগরের কাছে না কি দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে!'

প্রধানমন্ত্রী বললেন: 'বলে দাও ওদের আমরা চাল পাঠাচ্ছি। ঐ তোমার শ্যামগড় থেকে কিছু চাল ঐ দুর্ভিক্ষ অঞ্চলে পাঠিয়ে দাও।'

খাদ্য-মন্ত্রী বিস্মিত হ'ন। বলেন: 'তাহ'লে শ্যামগড়ে যে খাদ্যাভাব দেখা দেবে স্যর!'

: 'সে তো ছ'মাস বাদে হে! তত দিনে শ্যামগড়ে নিশ্চয় 'ক্লথ প্রব্লেম' এসে যাবে। ফুডের দিকে ওরা আর ঝোঁক দেবার সুযোগ পাবে না।'—প্রধানমন্ত্রী বললেন।

বিরোধীদলের নেতার বক্তৃতা শেষ হবার পর খাদ্য-মন্ত্রী জানালেন: 'খাদ্য-পরিস্থিতি সম্বন্ধে সরকার সম্পূর্ণ সচেতন। যাহাতে এই পরিস্থিতি

গুরুতর আকৃতির না হয়, তার জন্যে সরকার সমস্ত বন্দোবস্ত করেছেন। দুর্ভিক্ষ অঞ্চলে সরকার শীঘ্রই চাল পাঠাচ্ছেন।'

*   *   *

তিন দিন বাদে চাল-বোঝাই স্পেশাল ট্রেন ফতেনগরের অভিমুখে রওনা হলো।

*   *   *

ফতেনগরের লড়াই নিয়ে যখন দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন শুরু হয়েছে, তখন এক দিন দেশনেতা হারান চাটুজ্যে দৈনিক 'হরকরা'র দপ্তরের পানে রওনা হলেন। উদ্দেশ্য—এই আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁর এক বিবৃতি ছাপাবেন। বহু দিন কাগজে তাঁর কোন বিবৃতি বেরোয় নি। আজ ভোরবেলা তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের নেতা বাবুলাল সিংহের বক্তৃতা পড়েছেন। তিনি ভাবলেন, এখন থেকেই তৎপর না হলে ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে তাঁকে যে অনুতাপ করতে হবে, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। বাবুলাল সিংহের বক্তৃতা পড়ার পর হারান চাটুজ্যে তাঁর বিবৃতির এক খসড়া তৈরী করলেন। তার পর সেটাকে সযত্নে লিখে 'হরকরা'-দপ্তরে এসে উপস্থিত হলেন।

'হরকরা'র রিপোর্টারের রুম। লম্বা দুটো টেবিল পাতা। তার উপরে আছে গোটা পাঁচেক টাইপরাইটার মেসিন। এর মধ্যে দুটো মেসিন অচল, দুটোর ফিঁতে ফিকে হয়ে গেছে, কালি নেই। পাঁচ নম্বর মেসিনে কয়েকটা 'লেটার' নেই। টেবিলের এক পাশে প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজগুলোর ফাইল। একটা ঘড়ি আছে সাবেকী আমলের। গ্রীষ্মকালে চার ঘণ্টা ফাস্ট চলে, শীতকালে চার ঘণ্টা স্লো।

একটা মেসিনে বসে রিপোর্টার ব্যোমকেশ তার স্টোরি টাইপ করছিল। ব্যোমকেশের মনটা খুশী নেই, কারণ ফতেনগরের

লড়াইতে তার যাবার একটা সুদূর আশা ছিল। কিন্তু পতিতপাবন-বাবু যে তাঁর শ্যালক বুটলোকে এ কাজে পাঠাবেন, এ কখনও সে কল্পনা করে নি। তাই মনটা ব্যাজার হয়ে আছে। ভাবছে কী করা যায়। আর এই চিন্তার ফাঁকে, এক এক প্যারাগ্রাফ করে টাইপ করে যাচ্ছে। খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে দেশনেতা ও ব্যবসায়ীদের মন্তব্য নিয়ে এই স্টোরি।

এমনি সময় হারান চাটুজ্যে ঘরে ঢুকলেন। 'এই যে ব্যোমকেশ বাবু, কী খবর?'—হারান চাটুজ্যে প্রশ্ন করলেন।

: 'খবর আর কী! দুঃসংবাদ, চার দিকে অনাচার অবিচার চলছে।'

: 'ঠিক বলছেন, নইলে দেখুন না, বাবুলাল সিংগি আবার একটা লিডার! তার বিবৃতি কি না কাগজের প্রথম পাতায় ছাপা হয়'।—হারান চাটুজ্যে জবাব দেন।

হারান চাটুজ্যের এই উক্তি কিন্তু ব্যোমকেশের কানে গেলো না। সে বলে যায়: 'ঘরে-ঘরে হাহাকার, আর্তনাদ চলেছে। পৃথিবী ধ্বংসের মুখে। এটম বোমার বিস্ফোরণে সমস্ত জগৎ...' তার পর একটু থেমে বললে: 'বাই দি ওয়ে, হারানবাবু, আপনার সায়েন্স ছিল? 'রিলেটিভিটি' পড়েছেন?'

প্রশ্নটাতে হারানবাবু একটু হকচকিয়ে গেলেন। এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনের প্রয়োজন যে এখানেও হবে, এটা তিনি কল্পনা করেন নি। তাই একটু ম্লান মুখে বললেন: 'না, আমি আর্টসের ছাত্র।'

: 'আই সী। পড়ে দেখবেন 'রিলেটিভিটি'। বেশ সহজ। অন্ততঃ রিলেটিভদের চাইতে রিলেটিভিটি যে অনেক সহজ ও প্রাঞ্জল, এ আমি আপনাকে জোর গলায় বলতে পারি।'

তার পর কণ্ঠস্বর একটু নামিয়ে বলে : 'আমাদের দপ্তরের কাণ্ডখানা দেখেছেন ? ফতেনগরে এমন একটা যুদ্ধ চলছে, সেইখানে কিনা পতিতপাবনবাবু তার শ্যালক বুটলোকে পাঠালেন রিপোর্ট করতে। রিলেটিভের ব্যাপার ম'শায় ! আজ অবধি একটা ভালো স্টোরি পাঠাতে পারে নি। আর এদিকে 'সমাচারে'র প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পড়লুম। এ রকম মনমাতানো নিউজ আমি কক্ষনো পড়িনি।'

ব্যোমকেশের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল সাব-এডিটর প্রীতিবাবু। তিনি সায় দিয়ে বললেন : 'ঠিক বলেছেন ব্যোমকেশবাবু। আমি বলি কী, কর্তার এই 'চয়েস' সম্বন্ধে আমাদের প্রতিবাদ করা উচিত।

এক জন সমর্থনকারী পেয়ে ব্যোমকেশ একটু উত্তেজিত হয়ে পড়লো। বললে : দ্যাট্স রাইট। আমরা সবাই একমত। এই অন্যায় হতে দেবো না। প্রিয়ব্রতবাবু কোথায় ? চলুন তাকে নিয়ে এক বার সাধনবাবুর সঙ্গে আলোচনা করা যাক।'

দেশনেতা হারান চাটুজ্যে দেখলেন যে, অবস্থা ক্রমশ:ই আয়ত্তের বাইরে যাচ্ছে। অর্থাৎ আর এক মুহূর্ত দেরি হলে পর তাঁর বিবৃতি যে 'হবকরা'য় স্থান পাবে না, এ হারান চাটুজ্যে বিলক্ষণ জানেন। রিপোর্টারেরা উত্তেজিত হলে তারা কী বিষম কাণ্ড ঘটাতে পারে, এ কী তিনি জানেন না। বিলক্ষণ তাঁর জানা আছে। তাই এবার একটু ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন 'ব্যোমকেশবাবু, 'বিশ্বে শান্তি' এই নিয়ে আমার একটা বিবৃতি যদি কালকের কাগজে .... '

: 'বিশ্বে শান্তি !' আপনি বলেন কী হারানবাবু ? এই দপ্তরেই শান্তি নেই তার আবার বিশ্বে শান্তি ! কী যে বলেন'—ব্যোমকেশ জবাব দেয়।

: 'ঠিক বলেছেন। আমারও ঐ বক্তব্য। বিশ্বে শান্তি অসম্ভব। সেই জন্যেই তো এই বিবৃতিটা নিয়ে এলুম।'

এবার ব্যোমকেশ যেন একটু খুশি হয়। বলে : 'বেশ করেছেন। রেখে যান। দেবো ছাপিয়ে। ওহে প্রীতি, চলো সাধনবাবুর কাছে। এই অন্যায়ের একটা প্রতিবিধান চাই। প্রিয়ব্রতবাবু কোথায় ?'

প্রীতিকে নিয়ে ব্যোমকেশ সাধনবাবুর কাছে গেলো। হারান চাটুজ্যে বেরিয়ে এলেন। মুখ তাঁর গম্ভীর। তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না, 'হরকরা' ঐ বিবৃতি ছাপবে কি না।

হারান বাবুর গম্ভীর মুখ দেখেই 'সমাচারে'র দরোয়ানজী এগিয়ে এলো।

: 'জী হজৌর। হমারা বড় বাবু তো উপর বৈঠা হ্যায়'—দরোয়ানজী বলে।

'সমাচারে' বিবৃতি ছাপাব কথা হারানবাবুব একদম মনে হয় নি, কিন্তু দরোয়ানজীকে দেখে তাঁর মনে হলো যে, শুধু 'হরকরা'র উপর আস্থা রাখা উচিত নয়। তার বিবৃতি ছাপা হতেও পারে, না-ও হতে পারে।

হারানবাবু 'সমাচারে'র ব্রজানন্দবাবুব সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

*　　　*　　　*

সমস্ত ঘটনা শুনে ব্রজানন্দবাবু বললেন : 'কী বললেন, উত্তেজনা দেখে এলেন 'হরকরা'র স্টাফের মধ্যে ? আরে ম'শায়, এ তো জানা কথা। 'হরকরা'র মতো এ রকম বিশৃঙ্খলা আর কোন দপ্তরে পাবেন না। আর, আমার দপ্তরে দেখুন। স্টাফের মধ্যে একটু অসন্তোষের ভাব নেই।

ব্রজানন্দবাবুর কথাটা শেষ হবার আগেই প্রুফরীডার নৃত্যহরি বাবু এসে দাঁড়ালেন। ছ' মাসের বাকী মাইনের একটা স্লিপ্ করতে

এসেছেন তিনি। নৃত্যহরিবাবুকে দেখে ব্রজানন্দবাবু একটু শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। লোকটার একটু আক্কেল নেই। হয়ত এক্ষুণি সেই বাকী টাকাটা চেয়ে বসবে। তাই* নৃত্যহরি কিছু বলবার আগেই ব্রজানন্দবাবু বললেন: 'এই দেখুন, আমার স্টাফ। ছ' মাসের মাইনে এডভ্যান্স দিয়েছি। তার পর বোনাস—না হে, নৃত্যহরি ?'

ব্রজানন্দবাবুর কথা শুনে নৃত্যহরিবাবু একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ব্রজানন্দবাবু যে এ ধরনের কথা বলে তার তাগিদের হাত থেকে রেহাই পাবেন, এটা নৃত্যহরিবাবু কল্পনা করেন নি। শুধু তাঁর কণ্ঠস্বর থেকে একটা করুণ শব্দ বেরুলো। সে শব্দ 'হ্যাঁ', কি 'না' ঠিক বোঝা গেলো না।

এদিকে ব্রজানন্দবাবু বলে চলেছেন: 'আর 'সমাচারে'র সম্পাদকীয়ের কথা ধরুন না। এমন চমৎকার লেখা আর কোথায় পাবেন ? এই দেখুন না আমরা 'ডাইভোর্স বিলের' উপর যে সম্পাদকীয়টা লিখেছিলাম, সেটা পড়ে 'নারী-ক্লাব' (শুধু মাত্র বৃদ্ধাদের মধ্যে সংঘবদ্ধ) কী লিখেছেন··· হে সম্পাদক মহাশয়, আপনাদের প্রবল উত্তেজনাকারী বাগ-বিতণ্ডা-পূর্ণ সম্পাদকীয় পড়িলাম। আপনারা এই প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের মর্ম স্পর্শ করিয়াছে। আপনারা···

এর পরের অংশটুকু ব্রজানন্দবাবু আর পড়লেন না। কারণ, এর পরে যা লেখা আছে তা নিতান্তই 'সিডিশাস' এবং এই 'সিডিশাস' কথা এক বার যদি 'হরকরা'র কানে যায়, তাহলে পরিণাম কী হবে এ কথা ব্রজানন্দবাবুর জানা আছে।

এবার হারানবাবুর বলবার পালা। বললেন: 'একটা বিবৃতি এনেছিলাম। যদি 'সমাচারে' ছাপেন, তা হলে···

: 'আলবাৎ ছাপবো। কী যে বলেন! কিন্তু আমাদের এক্সক্লুসিভ দিচ্ছেন তো?'

: 'নিশ্চয়। এ তো 'সমাচারে'র জন্যে তৈরী করেছি। বিশ্বশান্তির উপর।'

বিশ্বশান্তি! হারানবাবুর কথা শুনে ব্রজানন্দবাবু একটু চমকে ওঠেন। বিশ্বশান্তির চাইতে 'গৃহশান্তির' যে বেশী প্রয়োজন, এ কথা ব্রজানন্দবাবু সম্প্রতি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। কারণ সেই 'ডাইভোর্স' বিলে'র উপর সম্পাদকীয়টা প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজানন্দবাবুর স্ত্রী, এবং সম্পাদক খগেনবাবুর স্ত্রী এই বিল কার্যকরী করে তোলবার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করছেন। এই সঙ্কট কালে কেউ যদি 'গৃহশান্তি' নিয়ে কোন বিবৃতি দেন, তাহলে মনে মনে ব্রজানন্দবাবু খুশিই হতেন। কিন্তু উপায় নেই। হারান বাবুকে কথা দিয়েছেন যে, তাঁর বিবৃতি প্রকাশ করবেন। তাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'রেখে যান। দেখি কাল কি পরশু ছাপবো।'

হারানবাবু তাঁর বিবৃতি দিলেন।

'সমাচার'-দপ্তরের বাইরে এসে হারানবাবু দেখতে পেলেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দেশনেতা বাবুলাল সিংহের গাড়ি এসে 'হরকরা' দপ্তরের সামনে দাঁড়িয়েছে। এই আগমনের কী হেতু, এটা বুঝে নিতে হারানবাবুর একটুও অসুবিধে হলো না।

—আট—

সাধনবাবুর চার দিকে গোল হয়ে বসে আছে ব্যোমকেশ, প্রীতি, প্রিয়ব্রতবাবুর দল।

ব্যোমকেশ বলছে: 'ছিঃ ছিঃ, কী লজ্জার ব্যাপার! গত কাল প্রেস-কনফারেন্সে ঐ 'সমাচারে'র রিপোর্টার টগর আমায় কী অপমানই

না করলে! কী বললে জানেন সাধনবাবু? বললে: 'বোমা, তোদের কাগজ না ফতেনগরে মনিবের শালাকে রিপোর্ট করতে পাঠিয়েছে? আজ পর্যন্ত একটাও অরিজিন্যাল স্টোরি তোদের কাগজে বেরুলো না। হ্যাঁ রে বোমা, তোদের ঐ শ্যালক বুটলো ক, খ, গ লিখতে জানে তো রে? তারপর সাধনবাবু ওরা সবাই মিলে কী হাসি-ঠাট্টাই না করলে।'

ব্যোমকেশের এই উক্তিতে প্রিয়ব্রতবাবুও সায় দেন। বলেন: 'সত্যি সাধন বাবু, এই ফতেনগরের লড়াইটা নিয়ে কী নাজেহালটাই না আমাদের হতে হচ্ছে! রোজ-রোজ 'সমাচার' প্রত্যক্ষদর্শীর বিশদ বিবরণ প্রকাশ করছে, অথচ আমরা কি না এ পর্যন্ত একটি ভালো স্টোরি ছাপাতে পারলুম না!'

প্রীতিবাবু বলেন: 'আমি তো তখনই বলেছিলুম আনকোরা লোকদের পাঠাবেন না। রিপোর্টিং তো চাট্টিখানি কথা নয়।'

এই সমস্ত মন্তব্য শুনে সাধনবাবু চুপ করে থাকেন। কারণ এ পর্যন্ত ফতেনগর থেকে বুটলো তেমন কিছু চমকপ্রদ খবর পাঠায় নি এ কথাটা সত্যি। কাল এক বার পতিতপাবনবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন: 'বলি ফতেনগর থেকে এলো কিছু?'

বিরস বদনেই সাধন বাবু জবাব দিয়েছিলেন: 'না তেমন কিছু পাইনি। এজেন্সীর খবর দিয়ে চালাচ্ছি।'

: 'কিন্তু ওদিকে যে 'সমাচারে' রোজ-রোজ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ছাপাচ্ছে। বলি, এর একটা হিল্লে করুন।'

: ''তার' পাঠাব?'—প্রশ্ন করেন সাধনবাবু।

: 'নিশ্চয়। পাঠাবেন মানে, পাঠান নি কেন?' সতেজ কণ্ঠে পতিতপাবনবাবু এ প্রশ্ন করলেন।

এর একটু বাদে সাধনবাবু পতিতপাবনবাবুর কাছে গিয়েছিলেন। সময়টা ছিল পতিতপাবনবাবুর দিবানিদ্রার আগে। সাধনবাবু গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: 'স্যর, অধ্যাপক রাধাকিশোরের সেই বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্বন্ধে লেখাটা...'

কথাটা শেষ হবার আগেই পতিতপাবনবাবু দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন। বললেন: 'আপনাকে কত বার বলেছি সাধনবাবু, এ সময়টা আমায় বিরক্ত করবেন না। ছিঃ! ছি!......'

: 'কিন্তু স্যর, ঐ অধ্যাপক রাধাকিশোরের লেখাটা সম্বন্ধে আপনার একটা মতামত না পেলে তো ছাপতে পারছি নে।'

: 'বলি, তোমার ঐ অধ্যাপক রাধাকিশোরটি কে?'—নিদ্রালু কণ্ঠে পতিতপাবনবাবু প্রশ্ন করলেন।

পতিতপাবনবাবুর জবাব শুনে সাধন বাবু একটুও স্তম্ভিত হলেন না। কারণ, মনিবের মতিগতি সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। আর এই অধ্যাপক রাধাকিশোরের ঘটনা এবং পতিতপাবনবাবুর সঙ্গে তার পরিচয় কি সূত্রে হলো, সেটাও সাধনবাবুর বিলক্ষণ জানা আছে।

অধ্যাপক হ'বার আগে এই রাধাকিশোর ছিলেন এক জন কনট্রাক্টর। একদিন মিস্ত্রীরা মিলে একটা দালান বানাচ্ছিল আর রাধাকিশোর সেই কাজেরই তদারক করছিলেন! আর সেই সঙ্গে মনের আনন্দে গুন্ গুন্ করে গান গাইছিলেন: 'যমুনা পুলিনে কুসুম...' সেই সময়ে গাড়িতে চেপে যাচ্ছিলেন বৈষ্ণব-সাহিত্যের দিকপাল নয়নকালীবাবু। রাধাকিশোরের গান শুনে গাড়িটা থামালেন। তার পর সামনে এসে বললেন: 'গাও তো আবার ঐ গানখানা। আহা কী চমৎকার পদাবলী......'

রাধাকিশোর আবার গুন্-গুন্ করে গাইলে......

'যমুনা-পুলিনে কুসুম-কাননে......।'

এই গান শুনে নয়নকালীবাবু আর এক মুহূর্ত দেরি করলেন না। রাধাকিশোরবাবুকে এনে গাড়িতে বসালেন। গাড়োয়ানকে কিছুই বলতে হলো না, কারণ ঘোড়া জানতো যে তার গন্তব্যস্থল কোথায়। গাড়ি সোজা চলো এলো কলেজের প্রিন্সিপালের বাড়িতে।

রাধাকিশোরকে প্রিন্সিপালের সামনে রেখে নয়নকালীবাবু বললেন: 'স্যর বাজিয়ে দেখুন। সাগর সেঁচে মানিক নিয়ে এলুম। বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্বন্ধে এমন 'অথরিটি' আর কোথাও পাবেন না। গাও তো বাবা রাধাকিশোর, 'যমুনা পুলিনে····'।'

গান গাইবার প্রয়োজন হলো না। কারণ, নয়নকালীবাবুর কথা প্রিন্সিপাল মেনে নিলেন। কলেজে রাধাকিশোরের চাকুরি হলো।

সেই দিন প্রিন্সিপালেব ঘরে পতিতপাবনবাবুও উপস্থিত ছিলেন। রাধাকিশোরবাবুব চাকুরি হ'বার খানিকটা বাদে পতিত-পাবনবাবু গিয়ে রাধাকিশোরকে অনুরোধ জানালেন, বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁব কাগজের জন্য প্রবন্ধ লিখতে। আজ সেই লেখা এসেছে। কিন্তু অধিকাংশই এমন দুর্বোধ্য হয়েছে যে, সাধনবাবু ঠিক করতে পারছিলেন না লেখাগুলোর কী সুবাহা করবেন।

তাই পতিতপাবন বাবুব প্রশ্নের উত্তরে বললেন: 'স্যর, অধ্যাপক রাধাকিশোর হচ্ছে বৈষ্ণব-সাহিত্যের একজন দিক্‌পাল, মানে এক কথায় 'অথরিটি' বলতে পারেন।'

: 'রেখে দাও তোমার 'অথরিটি'। বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্বন্ধে কেউ 'অথবিটি' নয়—অবশ্য স্বামী খলিলানন্দ ছাড়া। যাও, আমার ঘুমের ব্যাঘাত কোর না।'

পতিতপাবনবাবুর নাসিকা গর্জন করতে লাগলো।

আজ ব্যোমকেশ, প্রীতি ও প্রিয়ব্রতবাবুর কথা শুনে সাধন বাবু ভাবছিলেন যে, এ নিয়ে এক বার পতিতপাবনবাবুর সঙ্গে আলোচনা করবেন। কিন্তু সেই দুপুর বেলা! আজকে ঘুমের ব্যাঘাত হলে চাকুরি থাকবে না, এ সাধনবাবুর বিলক্ষণ জানা আছে। তাই একটু ইতস্তত বোধ করছিলেন।

এমনি সময় রিপোর্টার উমাকান্ত এসে উপস্থিত হলো। বললে: 'স্যর' দারুণ খবর। ফিফটি পার্সেণ্ট অব য়্যালিফ্যাণ্ট অব জোরোর সার্কাস কিল্ড।'

: 'কী বললে?' সাধনবাবু আবার প্রশ্ন করলেন।

: 'বিরাট ব্যাপার! জোরোর সার্কাস-পার্টিতে 'ফিফটি পার্সেণ্ট য়্যালিফ্যাণ্ট' মারা গেছে। বিগ স্টোরি।'

উমাকান্তের জবাব শুনে সাধনবাবু একটু নিরাশ হলেন। কারণ তিনি ভেবেছিলেন যে, উমাকান্ত হয়ত ফতেনগরের কোন ভালো খবর এনেছে। কিন্তু হাতীর খবর দিয়ে কী আর কাগজ ভরবে? তাই একটু উদাস কণ্ঠে বললেন: আচ্ছা, ফ্রন্ট পেজেই দাও তোমার ঐ স্টোরি। ফতেনগর থেকে আর যখন ভালো খবর এলো না, তখন ঐটে দিয়েই কাজ চালাতে হবে।

* * *

'সমাচার' দপ্তরে সম্পাদক খগেনবাবু দেশনেতা হারানবাবুর বিবৃতিটা দেখিয়ে বললেন: 'দেখলেন স্যর! আমাদের উপর ঐ হারান ব্যাটা কী জোচ্চুরিই না করলে! স্পেশাল ও এক্সক্লুজিভ বিবৃতি বলে চালিয়ে দিয়ে কী অপমানটাই না করালে! এই দেখুন না ওর বিবৃতি। স্রেফ কার্বন-কপি! দেশনেতা বাবুলাল সিংগির বিবৃতি থেকে টুকে দিয়েছে। ঐ পড়ুন।

'হরকরা' বাবুলাল সিংগির 'বিশ্বশান্তি'র উপর ঠিক এই বিবৃতি ছাপিয়ে বসে আছে। উফ্ কী কেলেঙ্কারী... ..

* * *

'সমাচারে'র রিপোর্টারের রুমে বসে রিপোর্টার টগর হাতে লিখে যাচ্ছিল—'পাঠকগণ, সাবধান হোন! কাল যে সংবাদ 'হরকরা' কাগজে 'ফিফটি পার্সেণ্ট য়্যালিফ্যাণ্ট' মারা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে, তাহা সর্বৈব মিথ্যা। 'সমাচারে'র বিশেষ রিপোর্টার এই সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, সার্কাস পার্টিতে মোট দুইটি হাতী ছিল। তাহার মধ্যে কারণ বশত একটির মৃত্যু ঘটে। এই একটি হাতীব মৃত্যু ঘটনাকেই 'হরকরা' 'ফিফটি পার্সেণ্ট' হাতীর মৃত্যু বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে। 'সমাচারে'র রিপোর্টার অনুসন্ধান করিয়া আরো জানিতে পারিয়াছেন, যাহাকে হাতী বলিয়া চালান হইয়াছে উহা আদৌ হাতী নহে। উহা একটি গণ্ডার। 'হরকরা'-দপ্তরের রিপোর্টার 'গণ্ডার' কী পদার্থ জানেন না, ইহা অবিশ্বাসযোগ্য। গণ্ডার হইল পতিতপা......'

উত্তেজনায় সাধারণত হাতের লেখা অস্পষ্ট হয়ে যায়। অতএব টগরের হাতের লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেলো। বাকীটা পড়া গেলো না।

* * *

দেশের চার দিকে যখন ফতেনগরের লড়াই নিয়ে হৈ-হল্লা শুরু হয়েছে তখন 'নারীর অধিকার' পত্রিকার সম্পাদিকা লুটিলুটি হালদার বসে বসে ভাবছিলেন, এ সময়ে তাঁর কী কর্তব্য।

'নারীর অধিকার' সাপ্তাহিক। পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের যে এক তালে চলতে হবে, এটাই হলো 'নারীর অধিকারের' আদর্শ। লুটিলুটি হালদার শুধু মাত্র এই পত্রিকার সম্পাদিকাই নন, তিনি

আরো বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। 'জাগ্রত হও নারী" 'নারী সহায় সমিতির' তিনি সভাপতি।

লুটিলুটি হালদার বিশ্বাস করেন যে, নারী ও পুরুষের সমান অধিকার। অতএব ফতেনগরে লড়াই যখন বেশ জমে উঠলো, এ লড়াইতে কার জয় অবশ্যম্ভাবী, এ নিয়ে যখন দেশের তরুণদের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়ে গেলো, তখন লুটিলুটি হালদার ভাবলেন যে, এইবার নারী জাতির দাবি সর্বসমক্ষে পেশ করা উচিত।

মিটিং করবেন! পাগল! আজ-কাল যা দিন-কাল পড়েছে, সভার আগে ও পরে চা না খাওয়ালে কেউ থাকতে চায় না। আর যদিও বা মিটিং হলো তা হলে সারাক্ষণ হয়ত নতুন ডিজাইনের শাড়ি কিংবা নতুন প্যাটার্নের বোনা নিয়ে আলোচনা চললো। আসল কাজের কথা একদম হয় না।

কী করতে পারেন তিনি? এ যুদ্ধে নারীদের কী কর্তব্য, এ নিয়ে তিনি রেডিওতে কিছু বলতে পারেন। কিন্তু এ বিষয়ে একটু সাবধানে কাজ করা উচিত। কারণ, অনেক দিন ধরে বিরোধী কাগজ 'নারীর দাবী' তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে। একটু মৌকা পেলেই হয়তো যাচ্ছেতাই করে গালিগালাজ দেবে। লুটিলুটি হালদার ভাবলেন যে, তিনি এমন কিছু একটা করবেন যাতে দেশবাসীর তাক লেগে যায়।

হঠাৎ তার মনে হলো, আচ্ছা এ লড়াইতে এক জন মেয়ে রিপোর্টার পাঠালে কেমন হয়? অর্থাৎ এ সংগ্রামে নারীজাতিও যে পিছিয়ে নেই, এইটে তার দেখানো চাই। প্রস্তাবটা মন্দ নয়, কিন্তু 'নারীর অধিকার' যে দৈনিকী নয়। সাপ্তাহিক কাগজ কি কখনও রিপোর্টার পাঠায়? এ কথাটা ভাবলেন লুটিলুটি হালদার।

ঠিক তার মনে হয়েছে, এ দেশে সাপ্তাহিক কাগজ রিপোর্টার পাঠায় না সত্য, কিন্তু বিলেতে? সাপ্তাহিক কাগজ তো দু-দুটো করে রিপোর্টার পাঠায়। যা ভেবেছেন, তাই তিনি করছেন অর্থাৎ সাপ্তাহিকের পক্ষ থেকে রিপোর্টার পাঠিয়ে তিনি পুরুষ জাতিকে 'জার্নালিজম' শিখিয়ে দেবেন।

প্রস্তাব মনোমত হলো সত্য, কিন্তু এবার ভাবতে লাগলেন কা'কে পাঠানো যায়।

হঠাৎ মনে হলো সহকারী-সম্পাদিকা বাণী দেবী তো আছেন। বেশ স্মার্ট মেয়ে। যেখানেই যাক না কেন, সেখানেই যে বাণী দেবী আর একটি খণ্ড যুদ্ধ বাধিয়ে দেবেন, লুটিলুটি হালদার এ কথা বিলক্ষণ জানেন।

অতএব ফতেনগর-রণাঙ্গনে বাণী দেবীর যাবার হুকুম হলো। আদেশ শুনে বাণী দেবী প্রথমে বেশ আপত্তি তুলেছিলেন, কিন্তু যেই মাত্র লুটিলুটি হালদার মহিলাদের অধিকারের 'দশ পয়েন্টের' মেমোরাণ্ডাম তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরলো, অমনি বাণী দেবী চুপ করে গেলেন। কারণ, এই দাবির সর্তগুলো সমস্তই বাণী দেবী রচিত ও লুটিলুটি হালদার কর্তৃক প্রচারিত।

ঠিক হলো, বাণী দেবী রণাঙ্গনে যাবেন ও সপ্তাহে একটি করে নারীর অধিকার কাগজের জন্যে ডেসপ্যাচ পাঠাবেন।

অতএব সমান অধিকারের দাবী নিয়ে বাণী দেবী ফতেনগরের রণাঙ্গন ক্ষেত্রে দর্শন দিলেন।

* * *

—নয়—

প্রেস-ক্যাম্পে বাণী দেবীর আগমনের বার্তা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে একটা আলোড়ন সুরু হয়ে গেল।

আরো বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। 'জাগ্রত হও নারী' 'নারী সহায় সমিতির' তিনি সভাপতি।

লুটিলুটি হালদার বিশ্বাস করেন যে, নারী ও পুরুষের সমান অধিকার। অতএব ফতেনগরে লড়াই যখন বেশ জমে উঠলো, এ লড়াইতে কার জয় অবশ্যম্ভাবী, এ নিয়ে যখন দেশের তরুণদের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়ে গেলো, তখন লুটিলুটি হালদার ভাবলেন যে, এইবার নারী জাতির দাবি সর্বসমক্ষে পেশ করা উচিত।

মিটিং করবেন! পাগল! আজ-কাল যা দিন-কাল পড়েছে, সভার আগে ও পরে চা না খাওয়ালে কেউ থাকতে চায় না। আর যদিও বা মিটিং হলো তা হলে সারাক্ষণ হয়ত নতুন ডিজাইনের শাড়ি কিংবা নতুন প্যাটার্নের বোনা নিয়ে আলোচনা চললো। আসল কাজের কথা একদম হয় না।

কী করতে পারেন তিনি? এ যুদ্ধে নারীদের কী কর্তব্য, এ নিয়ে তিনি রেডিওতে কিছু বলতে পারেন। কিন্তু এ বিষয়ে একটু সাবধানে কাজ করা উচিত। কারণ, অনেক দিন ধরে বিরোধী কাগজ 'নারীর দাবী' তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে। একটু মৌকা পেলেই হয়তো যাচ্ছেতাই করে গালিগালাজ দেবে। লুটিলুটি হালদার ভাবলেন যে, তিনি এমন কিছু একটা করবেন যাতে দেশবাসীর তাক লেগে যায়।

হঠাৎ তার মনে হলো, আচ্ছা এ লড়াইতে এক জন মেয়ে রিপোর্টার পাঠালে কেমন হয়? অর্থাৎ এ সংগ্রামে নারীজাতিও যে পিছিয়ে নেই, এইটে তার দেখানো চাই। প্রস্তাবটা মন্দ নয়, কিন্তু 'নারীর অধিকার' যে দৈনিকী নয়। সাপ্তাহিক কাগজ কি কখনও রিপোর্টার পাঠায়? এ কথাটা ভাবলেন লুটিলুটি হালদার।

ঠিক তার মনে হয়েছে, এ দেশে সাপ্তাহিক কাগজ রিপোর্টার পাঠায় না সত্য, কিন্তু বিলেতে? সাপ্তাহিক কাগজ তো ছু-ছুটো করে রিপোর্টার পাঠায়। যা ভেবেছেন, তাই তিনি করছেন অর্থাৎ সাপ্তাহিকের পক্ষ থেকে রিপোর্টার পাঠিয়ে তিনি পুরুষ জাতিকে 'জার্নালিজম' শিখিয়ে দেবেন।

প্রস্তাব মনোমত হলো সত্য, কিন্তু এবার ভাবতে লাগলেন কা'কে পাঠানো যায়।

হঠাৎ মনে হলো সহকারী-সম্পাদিকা বাণী দেবী তো আছেন। বেশ স্মার্ট মেয়ে। যেখানেই যাক না কেন, সেখানেই যে বাণী দেবী আর একটি খণ্ড যুদ্ধ বাধিয়ে দেবেন, লুটিলুটি হালদার এ কথা বিলক্ষণ জানেন।

অতএব ফতেনগর-রণাঙ্গনে বাণী দেবীর যাবার হুকুম হলো। আদেশ শুনে বাণী দেবী প্রথমে বেশ আপত্তি তুলেছিলেন, কিন্তু যেই মাত্র লুটিলুটি হালদার মহিলাদের অধিকারের 'দশ পয়েন্টের' মেমোরাণ্ডাম তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরলো, অমনি বাণী দেবী চুপ করে গেলেন। কারণ, এই দাবির সর্তগুলো সমস্তই বাণী দেবী রচিত ও লুটিলুটি হালদার কর্তৃক প্রচারিত।

ঠিক হলো, বাণী দেবী রণাঙ্গনে যাবেন ও সপ্তাহে একটি করে নারীর অধিকার কাগজের জন্যে ডেসপ্যাচ পাঠাবেন।

অতএব সমান অধিকারের দাবী নিয়ে বাণী দেবী ফতেনগরের রণাঙ্গন ক্ষেত্রে দর্শন দিলেন।

*　　　*　　　*

—নয়—

প্রেস-ক্যাম্পে বাণী দেবীর আগমনের বার্তা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে একটা আলোড়ন স্থুরু হয়ে গেল।

ব্যাক্সী ক্রুকসন বললে : কি বললে ? মেয়ে রিপোর্টার এসেছে ফতেনগরে ?

: তা নয়তো কি ? তুমি ভেবেছো কী লর্ড নর্থহ্যাম এসেছে। ছোঃ, তোমার বুদ্ধি!—একটু শ্লেষ কণ্ঠ নিয়ে গিদোয়ানী জবাব দেয়।

: আর আসবেই না কেন ? পুরুষের সঙ্গে নারীর সমান অধিকার। তাদের এই দাবি মানতে হবে আমাদের। রক্ত-চক্ষু দেখিয়ে, ইস্পাতের ঝিলিক দিয়ে তাদের আর হকৃচকানো যাবে না। এ-যুগে আর তোমাদের 'বুর্জোয়া' মতবাদ চলবে না। সমান অধিকারের দাবির যুগ—কমরেড নিটস্কি বললে।

গিদোয়ানী বললে : রামগোপাল, তোমায় কত বার মানা করেছিলুম মেয়েদের ঐ দাবি পেশ—এই সমস্ত নিয়ে অতো ফলাও করে কাগজে লিখো না। এখন নাও, ঠ্যালা সামলাও !

: ছাই আমি কি অতো জানতুম যে, শেষ পর্যন্ত এই রিপোর্টিং লাইনে মেয়েরা আসবে ?

জবাবটা আমি দিই—সত্যি ভাই, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। আমাদের এই টেকনিক্যাল লাইনে মেয়েরা কাজ করছে, এ আমি ভাবতেও পারছি নে।

: কেন করবে না শুনি ? এ কাজ করবার অধিকার ওদের সম্পূর্ণ আছে—কমরেড নিটস্কি জবাব দেয়।

: তুমি থাম তো কমরেড নিটস্কি—রুক্ষস্বরে বলে গিদোয়ানী।

: কমরেড নয়, কমরেড নয়,—বলো কামারাদ। সাধারণ একটা উচ্চারণ করতে জানো না ? তোমরা আবার রিপোর্টার !

: ছাখো, ভালো হবে না বলছি—গিদোয়ানী বলে।

: কি করবে শুনি ? মারবে নাকি ?—নিটস্কি জবাব দেয়।

ব্যারী বলে : সাইলেন্স—সাইলেন্স। আমি বলি কি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে কোন লাভ নেই। আমাদের আসল আলোচ্য বিষয় হলো, এই বাণী দেবী না রাণী দেবীর এই রণাঙ্গনে উপস্থিতি যে সমস্যা সৃষ্টি করেছে তাকে কি করে সমাধান করা যায়। তোমার কিছু বলবার আছে গিদোয়ানী? নাথিং, নাথিং, বেশ! তুমি নিটস্কি। তুমি বাণী দেবীকে সমর্থন করার পক্ষপাতী? তুমি রামগোপাল। কী অমন চুপ করে বসে আছো কেন?

এবার মুখ খুললে রামগোপাল। বললে : শোন, এই গোলমালে তোমরা তো আসল জিনিসটাই লক্ষ্য করোনি। শৈল কোথায়?

সবার দৃষ্টি যেন সেদিকে গেলো। একসঙ্গে চিৎকার উঠলো : শৈল কোথায়?

সবাই আমায় জিজ্ঞেস করলে : কোথায় তোমার বন্ধু?

আমিও একটু হকচকিয়ে যাই। কারণ, সত্যি বলতে কি এইখানে এসে সমস্ত সময়টাই শৈল আমার সঙ্গে কাটিয়েছে। কিন্তু আজ কোন মুহূর্তে সে যে উধাও হয়েছে সেটা আমি নিজেও টের পাইনি। আমি জবাব দিলাম : তা হলে নিশ্চয়···

: নিশ্চয় কোন স্টোরী পেয়েছে—বলে রামগোপাল।

: স্টোরী পেয়েছে—সবাই আবার একসঙ্গে চিৎকার করে ওঠে।

আমি যেন কি বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এই সমবেত কণ্ঠস্বরের মধ্যে আমার কথা যেন হারিয়ে গেলো। একটু বাদে আমিও ওদের সঙ্গে কণ্ঠস্বর মিলিয়ে বললাম : নিশ্চয়, স্টোরী পেয়েছে।

*　　　*　　　*

সেদিন বেশ রাত্তিরে এসে আমায় শৈল ডাকলে। বললে : দাদা, ঘুমিয়েছেন?

আমি ঘুমের ভাণ করে পড়ে থাকি।

শৈল আবার বলে : ঘুমুলেন নাকি ?

আমার কণ্ঠ থেকে এক বিচিত্র ধ্বনি বেরিয়ে আসে। কি যে জবাব দিয়েছিলাম মনে নেই। শুধু শুনতে পেলাম শৈল বলছে : বড্ডো বিপদে পড়েছি দাদা! 'হরকরা' দপ্তর থেকে কি 'তার' পাঠিয়েছে দেখেছেন। বলছে খবর পাঠাতে—

আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। জিজ্ঞেস করলাম : তার মানে আজ বিকেলে আপনি কোন 'স্টোরী' পাঠান নি।

: আপনি পাগল হলেন! এ পর্যন্ত এখানে এসে খবর আর পাঠালাম কৈ ? কিছু পুরানো বিলেতি কাগজের কাটিং এনেছিলাম। গত মহাযুদ্ধের বিবরণী। ভাবছি ঐগুলোই একটু ঝালাই করে চালাব নাকি ?

: গুড লর্ডস, আমি বলি : সত্যি বলছেন আজ বিকেলে কোন স্টোরী পাঠাননি ?

: আপনাকে আর মিথ্যে বলবো কেন দাদা! আজ বিকেলে কেন—কোন সকালেই, কোন বিকেলেই পাঠাইনি। পাঠাতে পারলে তো বর্তে যেতাম। এই দেখুন না, 'হরকরা' দপ্তর কী কড়া 'তার' পাঠিয়েছে। জিজ্ঞেস করছে খবর পাঠাচ্ছি না কেন ?

: আপনি আমায় বাঁচালেন। আজ প্রেস-ক্যাম্পের সবাই বলছিল আপনি নাকি বিকেলে একটা চমৎকার নিউজ পেয়েছেন, আমি তো খবরটা শুনে ভড়কে গিয়েছিলাম।

: পাগল হলেন ? আমি তো গিয়েছিলুম 'নারীর অধিকারে'র রিপোর্টার বাণী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে। উনি তো ঐ স্টেশনের ওয়েটিং রুমে আছেন। বেশ আদর-যত্ন করলেন। কাল আবার চা খাওয়াবার নেমন্তন্নও করলেন।

: সত্যি বলছেন ?

ঃ একদম সত্যি। বলে শৈল চলে গেলো।

*　　　*　　　*

শৈল চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গিদোয়ানী বিছানায় উঠে বসলে।

ঃ বিশ্বেস করলে তুমি ওর কথা? আমাদের ধাপ্পা দিচ্ছে।

ঃ কিসের ধাপ্পা?—আমি প্রশ্ন করি।

ঃ ঐ যে তোমায় বানিয়ে-বানিয়ে কথাগুলো বলে গেলো। চায়ের নেমন্তন্ন, আরো কতো কী। স্রেফ গাঁজা।

আমি শৈলকে সমর্থন করি। বলি—না, কথাটা সত্যি হতেও পারে তো।

ঃ তুমি বলছো সত্যি হতে পারে। আর যদি হলোই বা, তা হলে কি এটা উচিত হয়েছে বাণী দেবীর? আমরাও তো ছিলুম। আমরা কি আর চা খেতে জানিনে? উনি তো আমাদেরও চা খেতে নেমন্তন্ন করতে পারতেন! বলতে বলতে গিদোয়ানীর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

*　　　*　　　*　　　*

সেদিন রাত্রিবেলাই কমরেড নিটস্কি দেখা করলে বাণী দেবীর সঙ্গে। বললে ঃ আপনাকে সতর্ক করে দিতে এলুম। সাম্রাজ্যবাদীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে আপনার উপর।

কমরেড নিটস্কির কথা শুনে বাণী দেবী একটু বিস্মিত হলেন। প্রশ্ন করলেন ঃ সাম্রাজ্যবাদী—সে আবার কী!

ঃ ঐ যে আপনার রিপোর্টার! ক্যাপিটালিস্ট কাগজের প্রতিনিধি। বিশ্বেস করবেন না একটুকু ওদের। ওরা কি বলছিল জানেন?

ঃ কী? প্রশ্ন করেন বাণী দেবী।

এবার একটু দ্বিধায় পড়ে কমরেড নিটস্কি। কারণ, শৈলর অন্তর্ধানের দরুণ আজকের সভা মুলতুবী হয়েছে। বাণী দেবীর ব্যাপারটারও একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হয়নি। তাই একটু ভেবে

বললে : অবশ্য ঠিক বলেনি কিছু, কিন্তু বলবার সঙ্কল্প করেছিল। ওদের মনে কি রয়েছে জানেন, পটাসিয়াম সায়ানড। কাউকে বিশ্বেস করবেন না—বিশেষ করে ঐ গিদোয়ানী হতভাগাকে। লোকটা এমনি লেংড়ি দিতে পারে— .

বাণী দেবী কমরেড নিটস্কির কথা শুধু মাত্র শুনছিলেন। হ্যাঁ বা না, কিছুই বলেন নি। নিটস্কি বলতে লাগলো : প্রয়োজন যদি হয় তবে আমায় খবর দেবেন। 'এভরিথিং' আমি করে দেবো। কিস্সু ভাববেন না। হা……হা।

বাণী দেবী শুধু মাত্র সংক্ষিপ্ত ভাষায় বললেন : সত্যি আপনার অশেষ দয়া। অনেক ধন্যবাদ !

: ধন্যবাদ কেন ? এ তো আমার কর্তব্য। ঐ পুঁজিবাদীদের সঙ্গে লড়তে হলে আমাদের যে হাতে-হাত মিলিয়ে চলতে হবে।

নিটস্কি চলে গেলো।

* * * *

একটু বাদে অন্ধকার ভেদ করে দরজায় টোকা দিলেন রামগোপাল।

: আমি রামগোপাল। আমার কাগজের কাটতি হাজার পঞ্চাশেকের উপর হবে। ভেরী রেস্পন্সিবল পেপার। ঐ কমরেড নিটস্কির কাগজের মতো বাজে কাগজ নয়। আমাদের 'এডিটোরিয়াল' কলমের প্রতিটি মন্তব্য নিক্তিতে মাপা—একসঙ্গে রামগোপাল অনেকগুলো কথা বলে—

: কিন্তু কমরেড নিটস্কি বলছিলেন……

: নিশ্চয় বলবে। তবে নিশ্চয় আমাদের কাগজের কথা বলেনি। ঐ গিদোয়ানীর কাগজের কথা বলছিল। তা কী বলছিল ?—উৎসুক কণ্ঠে রামগোপাল প্রশ্ন করে।

: বলছিল যে সত্যি কথা নাকি একদম ও কাগজে ছাপা হয় না—বাণী দেবী বলেন।

: একদম খাঁটি কথা। একবার গিদোয়ানীর কাগজ কি করেছিল জানেন? ভুল করে সত্যি খবর ছেপে দিয়েছিল। ব্যস্ খবরটা যেই জানাজানি হয়ে গেলো, কাগজের সার্কুলেশন কমে গেলো। আর শুধু কি তাই? গিদোয়ানীর কাগজ পড়ে সরকার পলিসি ঠিক করতেন। অর্থাৎ কাগজে যা বেরুত ঠিক তার বিপরীত 'য়্যাকসন' নিতেন। খবরটা প্রকাশ হওয়া মাত্র তাঁরা বিপরীত 'য়্যাকসন' নিলেন। কিন্তু দু' দিন বাদে জানা গেলো যে খবরটা সত্যি। এই নিয়ে সরকারকে কী নাকালই না হতে হয়েছিল! অনেকগুলো টাকা ক্ষতি হয়ে গেলো। শেষে এক দিন কাগজের এডিটারকে ডেকে সরকার ধমকে দিলেন। বলা হলো, এই ভাবে সরকারকে নাজেহাল করা ঠিক হয়নি।

স্তব্ধ হয়ে বাণী দেবী এই কথাগুলো শুনছিলেন। রামগোপালের কথা শেষ হওয়া মাত্র বলেন : বলেন কী, এমনি কাণ্ড?

একটু লজ্জা-মিশ্রিত কণ্ঠে রামগোপাল বলে : কী আর বললাম? ঐ গিদোয়ানী, নিটস্কির হাঁড়ি যদি এক দিন ভাঙ্গি, তা হলে একেবারে থ' হয়ে যাবেন। থাক ও সব কথা; আর এক দিন হবে এখন। এবার নিচু গলায় রামগোপাল বললে : শুনুন, এই তল্লাটের কাউকে বিশ্বাস করবেন না। ধোঁকাবাজী দেবে। তবে এই শর্মার কথা আলাদা। নিশ্চিন্দি থাকতে পারেন। বিপদ-আপদে শুধু স্মরণ করলেই হলো। সমস্ত কিছু তৈরী পাবেন। আচ্ছা, আজ আসি, নমস্কার।

রাতের অন্ধকারেই রামগোপাল মিলিয়ে গেলো।

*　　　*　　　*

ঐ অন্ধকারে আর একজনের ছায়া দেখা যাচ্ছিলো। রাম-গোপালকে বেরুতে দেখে ছায়া একটু সরে গেলো। তারপর একটু বাদে গিয়ে রামগোপালের সামনে উপস্থিত হলো।

: আরে ব্যারী ব্রুকসন দেখছি! কী ব্যাপার? ঘুমুতে যাওনি?

: বড্ডো গরম। ভাবছিলাম এই দিকটায় যদি একটু হাওয়ার সন্ধান পাই। তা তুমি কোথায় গিয়েছিলে হে, এই অন্ধকারে? পাঠাবার মতো কোন মাল-মশলা পেলে?

কথাটা শুনে রামগোপালের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। বলে: যদি একটা কিছু পেতুম তা হ'লে কি আমায় এইখানে দেখতে পেতে হে? একটা খবর দেবার মতো খবর আর এবার পেলাম কই? এমনি ভাবে চললে আমি তোমায় হলপ করে বলতে পারি, ফতেনগরের লড়াই বন্ধ হয়ে যাবে।

: যা বলেছো ভায়া, পাব্লিসিটি বলো আর ঐ প্রোপাগাণ্ডাই বলো ঐ তো হলো লড়াইর আসল জিনিস। যে লড়াইর পাব্লিসিটি নেই, সে লড়াই আর ক'দিন চলতে পারে হে?

: ঠিক কথা বলেছো ব্যারী। কিন্তু এখন কি করি বলো তো? এদিকে তোমার ঐ কমরেড নিটস্কির যা ভাবগতিক দেখলাম, তা'তে বিশেষ সুবিধের মনে হলো না।

: কমরেড নিটস্কি আবার কী করলে হে?

: কি আর করবে। ঐ তোমাদের মেয়ে-রিপোর্টারকে তোমার নামে কী যাচ্ছেতাই বলে এসেছে। যাই বলো না কেন ব্যারী, নিটস্কির এই আচরণের একটা হেস্তনেস্ত আমাদের করতেই হবে।

: ঠিক বলেছো। ঐ সামনের মিটিংএ।

: দ্যাট্‌স রাইট। এই ব্যাপার সামনের মিটিংএ তুলতে হবে।

* * *

এদিকে গিদোয়ানীর কিন্তু ঘুম আসছিল না। বললে : ঐ ব্যারী ক্রুকসনের কাণ্ড দেখলে? চক্ষুলজ্জা বলেও তো একটা জিনিস আছে। বলা নেই, কওয়া নেই, নিজেকে প্রেস-কমিটির প্রেসিডেন্ট বানিয়ে বসে আছে। সেল্‌ফ স্টাইল্ড প্রেসিডেন্ট। আমি কিন্তু এর ঘোর আপত্তি করছি।

আমি চুপ করে থাকি। এর কোন জবাব দিই না। গিদোয়ানী বলে চলে : আমি তোমায় হলপ করে বলতে পারি ঐ চা-পার্টি সব কিছুই ব্যারীর কারসাজি। নিজেকে পাকাপোক্ত করে প্রেসিডেন্ট বলে ঘোষণা করাই তার মতলব।

আমাদের কথা চলতে থাকে।

* * *

পরদিন প্রেস-ক্যাম্পে আর এক বিশেষ সভা বসলো। ব্যারী ক্রুকসনই সভাপতিত্ব করলে। এতে গিদোয়ানী প্রথমটায় একটু আপত্তি করেছিল। আমি সেই প্রস্তাবে সায় দিয়েছিলাম, কিন্তু আপত্তি অগ্রাহ্য হয়ে গেলো।

ব্যারী ক্রুকসন জিজ্ঞেস করলে : আমাদের আলোচ্য বিষয় কী?

রামগোপাল বললে : নিশ্চয়, আমাদের আলোচনার একটা বিষয় থাকা উচিত। ওয়েল, গিদোয়ানী, তুমি কি বলো?

: আমি কিছুই বলিনে—জবাব দিলে গিদোয়ানী।

: গিদোয়ানী ইজ রাইট। বলবার কিছুই নেই—আমি বলি।

: আমি বলি কি আমাদের 'ওয়ার-এলাউন্স' নিয়ে আলোচনা করলে হয় না— ব্যারী জবাব দিলে।

: ঠিক বলেছো ব্রাদার! 'ওয়ার-এলাউন্স' নিয়ে আমাদের একটা হেস্ত-নেস্ত করা প্রয়োজন। আর কত কাল চলবে এই অত্যাচার!

স্টীম-রোলার চালিয়ে আর কত দিন আমাদের পিষে রাখা হবে?—কমরেড নিটস্কি উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকে।

কিন্তু কথার মাঝখানে রামগোপাল বাধা দেয়। বলে: তুমি থামো না নিটস্কি! আজকে এই সভার আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল বাণী দেবীর ক্ষতেনগরে আগমন।

: কিন্তু ব্রাদার, মেয়েদের নিয়ে আলোচনা আইনসঙ্গত নয়। আমি এর প্রতিবাদ করি।

: অবজেকসন ওভাররুল্ড। মেয়েরা কেন 'ওয়ার কভারেজ' করবে? আমি জানতে চাই—গিদোয়ানী বলে।

: গিদোয়ানী ঠিক বলেছে। বাণী দেবীকে আমাদের চোখে-চোখে রাখা প্রয়োজন। মেয়েমানুষ, এই লড়াই'র কতো 'টেকনি-কালিটিস' আছে। হয়তো উনি সব বুঝবেন না। তার পর ঐ সব আজে-বাজে কথা যদি ওর কাগজে পাঠিয়ে বসে, তা হ'লে কী কেলেঙ্কারী হবে বলো তো! গুড লর্ড, আমি তো ভাবতেই পারছি নে।

এবার আমি জবাব দিই: না হে, ব্যাপারটা বেশ চিন্তারই হয়ে দাঁড়ালো দেখছি। আমাদের একটু সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। নইলে আমাদের প্রফেশনের মান-ইজ্জত যাবে। কি বলো হে ব্যারী?

আমার কথা শেষ হবার আগেই শৈল এসে উপস্থিত। মুখে তার ব্যস্ততার ভাব। প্রায় চিৎকার করেই বললে: সর্বনাশ হয়ে গেছে!

: কী ব্যাপার? সবাই একসঙ্গে প্রশ্ন করি।

: ঐ তোমার মেয়ে-রিপোর্টার কি বলে জানো? আজকে আমায় চা'য়ের নেমন্তন্ন করেছিল। বললে, আচ্ছা শৈলবাবু,

ফতেনগরে লড়াইটা কোথায় হচ্ছে বলুন তো? এখন পর্যন্ত তো কিস্‌সু দেখতে পেলাম না!

তাই নাকি? এ কথা বললেন বাণী দেবী? সবিস্ময়ে আমি প্রশ্ন করি।

: আহা, লড়াইটা উনি দেখতে পাবেনও না। আমরাই দেখতে পেলাম না, আর উনি তো ছার! সাধে বলে মেয়ে-বুদ্ধি? রামগোপাল মন্তব্য করলে।

এবার শৈল জবাব দেয়। বললে: আরও কি বললে জানেন। বললেন, উনি ফতেনগরের ফ্রণ্ট দেখতে যাবেন।

: গুড হেভেন্স, এই কথা বলেছে! ব্যারী ব্রুকসন বলে।

: না, একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে দেখছি। আমি তো প্রথম থেকেই এ বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে আসছি। এখন ঠ্যালা সামলাও।

গিদোয়ানী তার কথা শেষ করতে পারলে না। কমরেড নিটস্কি প্রায় হুঙ্কার দিয়ে উঠলো। বললে: ছাখো গিদোয়ানী, এখানে তোমাদের সাম্রাজ্যবাদ চলবে না। যুগের গতি পাল্টেছে। মেয়েদের সমান অধিকার মানতেই হবে। নইলে—

: নইলে কী হবে শুনি? তোমার তো চিন্তা-ভাবনা নেই। খবর সত্যি হলো কি মিথ্যে হলো। আর আমরা যে খবর পাঠিয়েছি, এগুলো প্রতিবাদ হলে কি আর দপ্তরে মুখ দেখাতে পারবো— গিদোয়ানী বলে।

: গিদোয়ানী, আমি তো ভেবেছিলুম যে, দপ্তরে তুমি মুখ দেখানো বন্ধ করে দিয়েছো। ব্যারী উত্তর দিলে।

: ছাখো ব্যারী, এটা ঠাট্টার সময় নয়। সিচুয়েশান কতো 'সিরিয়াস' ভেবে দেখেছো কি?

: আমার কাগজের নিন্দে আমি সইবো না। আমি চললুম—নিটস্কি যাবার উপক্রম করে।

: কোথায় যাচ্ছো? আমি প্রশ্ন করি।

: যেখানে খুশি। 'আইডোলজিক্যাল' পার্থক্য নিয়ে তোমাদের সঙ্গে কাজ করা অসম্ভব। আই মাস্ট গো, আই মাস্ট প্রটেস্ট, আই মাস্ট…

: কমরেড নিটস্কির এই সব উক্তি ঘোরতর আপত্তিজনক। হি মাস্ট উইথড্র হিজ ওয়ার্ডস—গিদোয়ানী চিৎকার করে বললে।

: উইথড্র মাই ওয়ার্ডস! নেভার। কস্মিন্‌কালেও নয়…

: মিঃ প্রেসিডেন্ট, দিজ ইজ অবজেকসনবল, মানে আপত্তিকর, অন্যায়…

: ইউ সাট আপ…

: আই প্রটেস্ট।

: নিটস্কি ইজ এ…

অনেকের চিৎকারে বাকি কথাগুলো শোনা গেলো না। শুধু সভাপতি ব্যারী ব্রুকসনের একটা কথা শোনা গেলো। 'দিস্ মিটিং ইজ এডজোর্ণড় সাইনে ডাই।'

*　　　*　　　*

সভার কিছুক্ষণ বাদে ব্যারী ব্রুকসন এসে রামগোপালকে বললে: রাম, নিটস্কির কাণ্ডটা দেখলে? তোমায় আমি কতো বার বলেছি… ও কি ব্যাপার? অমন চুপ করে বসে রইলে কেন?

: আরো, বলো কেন ব্যারী! এদিকে তোমার ঐ মেয়ে রিপোর্টারের কাণ্ড দেখেছো?

: কেন সে আবার কী করলে?

: এই পড়ো।

ব্যারীর হাতে রামগোপাল এক টেলিগ্রাম দিলে : টেলিগ্রামে বলা হয়েছে যে, 'নারীর অধিকারে'র বিশেষ সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত খবরে জানা গিয়াছে যে, ফতেনগরের লড়াই সম্বন্ধে যে সব ভয়াবহ কাহিনী কাগজে প্রকাশিত হইতেছে—তাহা অতিরঞ্জিত, অতএব…ইত্যাদি।

টেলিগ্রাম পড়ে ব্যারী বললে : আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছিনে যে, ঐ মেয়েটা এই সব কথা লিখবে। কি বিশ্রী কাণ্ড, বলো দিকিনি! কি রকম 'আনজার্ণলিস্টিক' কাজ করলে মেয়েটা!

: যা বলেছো, খবরের প্রতিবাদ করা বিংশ শতাব্দীতে অচল। —রামগোপাল জবাব দিলে।

: ঠিক কথা। আচ্ছা, কাক কি কখনও কাকের মাংস খায়? রিপোর্টার হয়ে মেয়েটা আমাদের অপমান করালে! আমাদের খবরের প্রতিবাদ করলে?

: ও আবার কাক হলো কবে হে! ওতো চড়ুই, চড়ুই হে। উড়ে এসে বসেছে—

: ঠিক বলেছো। কিন্তু এখন কি করা যায় বলো দিকিনি?

: আমিও ভাবছি, কী করা যায়! দি আইডিয়া, আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। দি আইডিয়া। ব্যারী ব্রুকসন, আমার প্ল্যান কমপ্লিট।

: শুনি তোমার প্ল্যানটা—ব্যারী ব্রুকসন উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করলে।

: একটু সবুর করো দাদা! একটু সবুর করো। দেখতে পাবে মজাখানা……

* * *

গিদোয়ানীর হাতে টেলিগ্রামটা দিয়ে বললাম ঃ মেয়েটার কাণ্ড দেখলে ? শৈলকে যা যা বলেছিল, সব ওর কাগজে পাঠিয়ে দিয়ে বসে আছে। এই ত্যাখো 'তার' এসেছে, আমার দপ্তর থেকে। কৈফিয়ৎ চাইছে······

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গিদোয়ানী বলে ঃ আমায় বলছো ? এই ছ্যাখো আমার দপ্তর কি লিখেছে। সত্যি বাপু, কোথাকার একটা মেয়েদের কাগজ, সে কী লিখলো না লিখলো, এ নিয়ে দপ্তর যে কেন মাথা ঘামায়, এ আমি বুঝতেই পারছিনে !

ঃ আমিও ঠিক সেই কথাই ভাবছিলাম—আমি জবাব দিলাম।

* * *

সমস্ত সংবাদপত্র-জগতে এক তুমুল আলোড়ন স্থুরু হয়ে গেছে। এই চাঞ্চল্যের কারণ 'নারীর অধিকারে'র সম্পাদকীয়। সম্পাদিকা লুটিলুটি হালদার লিখেছেন ঃ পাঠিকাগণ, আপনারা দেখুন, পুরুষেরা আজ-কাল নারী-জগতকে কি প্রকার ধাপ্পা দিতেছে। ফতেনগরের লড়াই সম্বন্ধে ভ্রান্ত সংবাদ প্রচারিত করিয়া তাহারা নারী-সম্প্রদায়কে কী বিপদে ফেলিয়াছেন তাহা আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। এই মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত হওয়ার দরুণ সমস্ত জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া গিয়াছে এবং স্বামীগণ যে টাকায় সংসার চালাইতে বলিতেছেন তাহা যে অসম্ভব, আশা করি সে সম্বন্ধে আমাদের কোন মন্তব্য না করিলেও চলিবে। পুরুষদের এই প্রকার প্রতারণা অসহ্য !

'নারীর অধিকার' আরো লিখলে ঃ ইহার পূর্বেও বহু বার পুরুষেরা আমাদের ভাঁওতা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু আমরা কিছু বলি নাই। পুরুষেরাই যে 'সমাচার' ও 'হরকরার'র মহিলা বিভাগ পরিচালনা করিয়া থাকেন, ইহা আমাদের জানা থাকা সত্ত্বেও চুপ করিয়া গিয়াছি। শুধু কি তাহাই, কিছু দিন পূর্বে 'হরকরার' 'রান্নাঘর'

বিভাগে 'মুর্গীর সন্দেশের' যে নতুন পদ্ধতি লেখা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ ভুল। আমরা 'হরকরা' বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী মুর্গীর সন্দেশ রান্না করিয়া দেখিয়াছি। তাহাতে মুর্গীর সন্দেশ হয় না, কচুর ঘণ্ট হয়। আমাদের এই ভাবে কেন প্রতারণা করা হয় তাহার কৈফিয়ৎ চাই......

* * *

গালে হাত দিয়ে পতিতপাবনবাবু 'নারীর অধিকারে'র সম্পাদকীয় পড়লেন। এই মন্তব্য প্রকাশিত হ'বার পর রাত্রে বাড়ি ফেরা উচিত কি না, সেই সম্বন্ধে গভীর চিন্তা সুরু করলেন।

* * *

ব্রজানন্দবাবুও বাড়িতে বলে পাঠালেন যে, সে রাত্রে তিনি দপ্তরেই কাটাবেন।

* * *

বাণী দেবীর সঙ্গে রামগোপালের হঠাৎ ডাকঘরের সামনে দেখা।

রামগোপাল জিজ্ঞেস করলে : আপনার তো সাপ্তাহিক। আপনি স্টোরী টেলিগ্রাম করেন কেন ?

: স্টোরী টেলীগ্রাম করতে আসিনি তো। এমনি একটা ডাক-টিকিট কিনতে এসেছিলাম—বাণী দেবী হেসেই জবাব দিলেন।

বাণী দেবীর আজ মন প্রসন্ন। লুটিলুটি হালদার তাকে প্রশংসা করে তার পাঠিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বলেছেন, নতুন কোন চাঞ্চল্যকর ঘটনা থাকলে যেন অতি অবশ্য পাঠানো হয়।

রামগোপাল ভাবছিল কি করে বাণী দেবীকে জব্দ করা যায়। কী জাঁহাবাজ মেয়ে বাবা! 'নারীর অধিকারে' কী যা তা ডেসপ্যাচ পাঠিয়ে দিয়ে বসে আছে। ফতেনগরে লড়াই বড় বেশী হয়নি, রিপোর্টারেরা ভুল খবর দিচ্ছে—ইত্যাদি। 'নারীর অধিকারে'র

রিপোর্ট পড়ে রামগোপালের দপ্তর কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠিয়েছে। এখন সে কী জবাব দেবে?

হঠাৎ রামগোপাল বললে: 'কনগ্রাচুলেশন' বাণী দেবী। আপনার স্টোরী ফার্স্টো ক্লাস হয়েছে। আমি হলপ করে বলতে পারি, অমন আর কেউ লিখতে পারতো না।

: আপনার ভালো লেগেছে, ধন্যবাদ—বাণী দেবী হেসেই জবাব দিলেন।

: নিশ্চয়।

তার পর বললেন: বাণী দেবী, মস্তো বড়ো কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে ফতেনগরে। বিদেশী শক্তি গুপ্তচর পাঠিয়েছে। নিজ চোখে দেখে এলুম। তার পর এই মাত্র থ্রি হাণ্ড্রেড ওয়ার্ডের স্টোরী পাঠিয়েছি।

: সত্যি বলছেন—বেশ উত্তেজনার কণ্ঠস্বর নিয়ে বাণী দেবী বললেন।

: কী যে বলেন! এই শর্মা ভুল করে মিথ্যে কথা লেখে বটে কচিৎ-কদাচিৎ, কিন্তু ভুল করে মিথ্যে বলে না।

এর পরে ফিস-ফিস করে বললে: শুনুন বাণী দেবী! কাউকে বলবেন না। ডি ল্যুক্স ফার্মেসী দেখেছেন ঐ বাজারের কাছে? ঐখানে একটা বিদেশী শক্তির গুপ্তচর শুয়ে আছে। আমি তো এই মাত্র ওর সঙ্গে কথা বলে এলুম। বিশ্বেস না হয় নিজের চোখেই দেখে আসুন না।

: বলেন কী? বিস্মিত হয়ে বাণী দেবী প্রশ্ন করলেন।

: কী আর বলবো! সব সত্যি কথা। লোকটা ঐ ডি ল্যুক্স ফার্মেসীর দাওয়ায় বসে আছে। দেখলে মনে হয় ভিখিরী, কিন্তু সত্যি কথা বলছি আপনাকে, ঐ হলো গুপ্তচর। লোকটি এমনি

ভাণ করছে যেন ইংরেজী জানে না। দেখবেন একটু সাবধানে কথা বলবেন।

*　　　　*　　　　*

ডি ল্যুক্স ফার্মেসীর কাছে এসে বাণী দেবী দেখতে পেলেন যে, সত্যি একজন বিদেশী বসে আছে। তার মলিন বস্ত্র দেখলে বোঝবার উপায় নেই লোকটি কোন দেশীয়।

প্রশ্ন করলেন বাণী দেবী ঃ আপনি এখানে নতুন এসেছেন?

মাথা নেড়ে লোকটা জবাব দিলে। বাণী দেবীর প্রশ্ন বুঝতে পারলে কি না বোঝা গেলো না।

বাণী দেবী মনে মনে বললেন, এ তো আচ্ছা বিপদে পড়া গেলো দেখছি!

বাণী দেবী আবার জিজ্ঞেস করেন ঃ কোত্থেকে এসেছেন আপনি?

আবার সেই একই জবাব।

ঃ বলি, কেন এলেন এখানে?

কিন্তু অবস্থার কোন উন্নতিই হলো না। মাথা নাড়া ছাড়া লোকটি যে কিছুই বলে না। তা হলে হয়তো ইংরেজী জানে না। বিদেশী! কিন্তু বিদেশী হলে এ বেশে কেন? হয়ত গুপ্তচর। ঠিকই বলেছে রামগোপাল।

একটু বাদে রামগোপালের সঙ্গে বাণী দেবীর আবার দেখা হলো।

ঃ সত্যিই লোকটার হাব-ভাব দেখে কিছুই বুঝতে পারলুম না। কোত্থেকে এসেছে, কেন এলো?

ঃ ঐ তো বিপদ বাধালেন আপনি। আসল কথা শুনুন, আমি আপনাকে হলপ করে বলে দিতে পারি লোকটা 'ফরেইনার'। অর্থাৎ কি না 'ফরেইন ইণ্টারভেনশন ইন ফতেনগর।' এই

তেপান্তরের মাঠে লোকটা যে হাওয়া খেতে আসেনি, এ আপনি নিশ্চিন্দি থাকতে পারেন।

: তা হ'লে কি করি বলুন তো ?

: কি করবেন, এ নিয়ে ইতস্তত বোধ করছেন ? শুনুন, আপনার কাগজ তো সাপ্তাহিক। এই যে বিদেশী শক্তির চক্রান্ত কিংবা অদূর ভবিষ্যতে বিদেশী শক্তির চক্রান্ত হতে পারে এ নিয়ে কষে লিখুন। দেখবেন সরকার সতর্ক হয়ে উঠবে।

একটু দ্বিধায় পড়লো বাণী দেবী। বিদেশী শক্তির আগমন, এই নিয়ে কিছু লিখবেন কি না, এই হলো চিন্তার বিষয়। কিন্তু যদি আর বাকি সবাই পাঠিয়ে থাকে এই খবর, তাহ'লে ? কী কেলেঙ্কারীই না হবে। লুটিদি' তাকে আস্তো রাখবেন না। লুটিদি' সব সহ্য করতে পারেন, কিন্তু পুরুষের কাছে পরাজয় ? অসম্ভব ! অসম্ভব !

'নারীর অধিকারে' এই খবরটা বেশ ফলাও করে ছাপা হলো। কিন্তু যে হৈ-চৈ এ সংবাদ সৃষ্টি করলো, সে হলো অতি ক্ষণস্থায়ী। কারণ, দু'দিন বাদে ফত্তেনগর থেকে বিভিন্ন কাগজের বিশেষ সংবাদ-দাতারা লিখলেন : যাঁকে বিদেশী বলে 'নারীর অধিকারে' বলা হইয়াছে, তিনি আদৌ বিদেশী নহেন। তাঁর প্রকৃত নাম ঘণ্টারাম। ঘটনার দিন একটু বেশী মাত্রায় অহিফেন সেবন করার দরুণ তাঁর কথাবার্তা সমস্ত জড়াইয়া যায় এবং 'নারীর অধিকারে'র সংবাদদাতার কোন প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন নাই। ঘণ্টারাম সবে মাত্র কয়েদ-খানা হইতে ছাড়া পাইয়াছেন। তাই তাঁর পরিধানের বস্ত্র নিতান্তই জীর্ণ ছিল। যদিও তাঁহার চেহারার মধ্যে বিদেশীর ছাপ ছিল, আসলে তিনি বিদেশী নন। 'নারীর অধিকারে'র প্রকাশিত সংবাদ নিতান্ত মেয়েলি।

*　　　*　　　*

এই খবরের উপর সাপ্তাহিক 'কর্কট' যে মন্তব্য করলে, তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। 'কর্কট' লিখলে: আমরা বহুবার বলিয়া আসিয়াছি যে, হেঁসেল-ঘর ও রণাঙ্গন এক ক্ষেত্র নয়। আমরা জুটিজুটি হালদারকে এই ধরনের ঘুমপাড়ানী গল্প শুনাইতে নিষেধ করি। ইহার চাইতে তিনি যদি 'কচুর ঘণ্টের' নতুন ফর্মুলা নিয়া গবেষণা করিতেন, তাহলে দেশের খাদ্যসমস্যা অনেকটা লাঘব হইয়া যাইত। আমাদের বক্তব্য যে, ভবিষ্যতে নারী জাতি যেন এই ধরনের স্পেশালাইজড কাজে হাত না দেন। ইত্যাদি ইত্যাদি···

*　　　*　　　*

'দৈনিক সমাচার' লিখলে: ইহা তো আমরা পূর্বেই জানিতাম। ফতেনগরের লড়াই ছেলেমানুষী ব্যাপার নয়, এ কথা 'নারীর অধিকারে'র সম্পাদিকার জানা উচিত ছিল। আমরা আবার বলিতেছি, ফতেনগরের পতন শুভস্য শীঘ্রম্। এই সামান্য কথাটি জুটিজুটি হালদার যদি না জানেন, তাহলে স্বামী খলিলানন্দ এ বিষয়ে বিনামূল্যে তাঁহাকে উপদেশ দিতে ও ভবিষ্যদ্বাণী করিতে প্রস্তুত আছেন।···

*　　　*　　　*

পতিতপাবনবাবু সাধনবাবুকে ডেকে বললেন: পড়েছেন সব?

: কোন্‌টা স্যর?

: আবার কী! ঐ তোমার 'নারীর অধিকারে'র কেলেঙ্কারী। কত বার বলেছি যে, মেয়েদের···কথাটা পতিতপাবনবাবু শেষ করলেন না। দেয়ালেরও কান আছে। যদি গৃহিণী এ কথা জানতে পারেন তা হলে? থাকগে, এই সব বিপদজনক কথা নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। তাই একটু চুপ করে বললেন: দেখলেন

তো 'সমাচার' লিখছে, ফতেনগরের পতন অবশ্যম্ভাবী। শুনুন, আপনি বুটলোকে 'তার' পাঠান।

: কি জিজ্ঞেস করবো স্যর ?

: কি আর জিজ্ঞেস করবেন। জিজ্ঞেস করুন, ফতেনগর ক্যাপচারড অর নট ক্যাপচারড।

* * *

ওদিকে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে লুটিলুটি হালদারের। তিনি বাণা দেবীকে ফিরে আসবার আদেশ দিলেন।

* * *

—দশ—

এই ঘটনা যখন ঘটছিল তখন কামারাদ নিটস্কি গম্ভীর হয়ে ফতেনগরের প্রেসক্যাম্পের সামনে পায়চারি করছিল।

চিন্তার কারণ আর কিছুই নয়। দপ্তর থেকে তার এসেছে এই সংগ্রামের উপর 'পাবরিয়্যাকশন' অর্থাৎ কি না ফতেনগরের জনমত পাঠানো হয়নি কেন ?

জনমত! বিস্মিত হয়ে কামারাদ নিটস্কি ভাবলে, সত্যিই আজ পর্যন্ত এই লড়াইনিয়ে জনসাধারণ কি ভাবছে, কি করছে কিছুই তো লেখা হয়নি ?

কামারাদ নিটস্কি ভাবলে, কোন বাড়ির গিন্নীকে জিজ্ঞেস করবেন এই লড়াই সম্বন্ধে তাঁর কি মতামত। অর্থাৎ এই লড়াইর দরুণ তাঁকে সংসার চালাতে বেগ পেতে হচ্ছে কি না ?

কামারাদ নিটস্কি পোস্ট-অফিসের পানে রওনা হলেন। মতলবটা তাঁর যে, পোস্ট-অফিসের সামনের কোন বাড়িতে গিয়ে 'পাবলিশ্যাকশন' জেনে নেবেন।

পোস্ট-অফিসের কাছে এসে তাঁকে কোন বাড়িতে যেতে হলো না। কারণ, পোস্ট-অফিসের সামনে কামারাদ নিটস্কি বিলাসিনীর দেখা পেলেন।

: হেঁ, হেঁ, আমি কামারাদ নিটস্কি। হেসেই নিটস্কি বলে।

নবীনের সাথে প্রেমটা বিলাসিনীর ভালো করে না জমার দরুণ মনটা তার একটু বিগড়ে ছিল। বেশ একটু ঝামটা দিয়ে বললে : আমার বাপু কামারের দরকার নেই। খুন্তির একটা দরকার ছিল। ওটা বাজার থেকেই কিনে এনেছি।

: না, না, আমি কামার নই। মানে আমি হলুম গিয়ে নিউজ-পেপারম্যান অর্থাৎ কি না খবরের কাগজের লোক। নিটস্কি ব্যস্ত হয়ে বিলাসিনীর ভুল সংশোধন করবার চেষ্টা করে।

: বেশ তো পাঁচ সের কাগজ পাঠিয়ে দিও। উনুন ধরাতে লাগবে।

কামারাদ নিটস্কি স্পষ্টই বুঝতে পারলে যে, যাকে সে 'ইণ্ট্যার-ভ্যিউ' করছে সে বড়ো কঠিন পাত্রী। কিন্তু দমলে চলবে না। তার আগমনের প্রকৃত কারণ বুঝিয়ে দিতে হবে। তাই আবার বললে : এই যে লড়াইটা চলছে এটা সম্বন্ধে আপনার মতামত একটু জানতে পারলে···

বিলাসিনী কথাটা শেষ হতে দিলে না। বললে : ও মা, এ কি বিতেকিচ্ছিরি কথা গো। লড়াই আমি করবো কেন? ঐ নবনেই তো করলে। বললে···

: ব্যস্, ব্যস, আর আপনাকে কিছু বলতে হবে না। সব বুঝে নিয়েছি। এই লড়াইতে আপনার বেশ কষ্ট হচ্ছে। কষ্ট তো হবেই।

এই সাম্রাজ্যবাদী, নরঘাতকদের চক্রান্ত, ও হলো অক্টোপাসের বন্ধন, বুর্জোয়াদের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ···

*   *   *

কমরেড নিটস্কি 'তার' পাঠালে : 'বুভুক্ষা'র বিশেষ সংবাদদাতা একজন গৃহকর্ত্রীকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, বুর্জোয়াদের স্টীমরোলার জনসাধারণকে···ইত্যাদি ইত্যাদি।

*   *   *

'হরকরা' দপ্তরের টেলিগ্রাম শৈল আমায় দেখালে। বললে : কী বিপদে পড়লাম! এখন কি করি বলুন তো? দপ্তর 'তার' পাঠিয়েছে। বলছে : "Confirm or deny the fall of Fatehnagar," আরে এদিকে লড়াই যে মন্থর গতিতে চলছে, এতে কি আর শিগ্‌গির ফতেনগর দখল হ'বার যো আছে?

আমি হেসে জবাব দিই : যা বলেছেন। লড়াই কি আর চাট্টিখানি কথা যে সুরু হলো আর শেষ হলো! লিখে দিন,—Fatehnagar not captured.

: ঠিক কথা। এই 'তার' এক্ষুণি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

*   *   *

'তার' অফিসের সারখেল বাবু মনের আনন্দে গুন্‌গুন্ করে সিনেমার একটা নতুন গান গাইছিলেন। অনেক দিন পরে তিনি হাত-পা ছড়িয়ে একটু বসতে পেরেছেন। এই কয়েক দিন তাকে কী কাজটাই না করতে হয়েছে! রোজ-রোজ অতোগুলো করে টেলিগ্রাম করা কি আর চাট্টিখানি কথা! এমনি সময়ে শৈল এসে উপস্থিত হলো। আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম। 'ফতেনগর নট ক্যাপচারড্।' কী করবেন তিনি! বেশ গম্ভীর হয়েই আবার কাজে বসে গেলেন।।

: কতোক্ষণ লাগবে এ টেলিগ্রাম যেতে?

: কতোক্ষণ আর ! এই ঘণ্টা দু'য়েকের ব্যাপার আর কি।

শৈল চলে গেলো। সারখেল বাবু আবার গান ধরলেন। আর টেলিগ্রামের যন্ত্রটা নিয়ে ডাকলেন 'ধারাপুকুর' তার অফিসকে। সারখেল বাবু গানের এক-একটা কলি গুন্‌গুন্ করেন, আর 'তার' পাঠাতে থাকেন। টরে-টক্কা-টরে-টক্কা…নাঃ কী বিচ্ছিরি হাতের লেখা রে বাপু ! কিস্‌সু বুঝতে পারা যায় না। এটা কি লিখেছে ? ফতেনগর। বেশ, বেশ। তারপর লোকটা গেলো কোথায় ?

সারখেল বাবু মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন যে শৈল চলে গেছে। এখন কী করবেন তিনি ? এদিকে ধারাপুকুর যে জিজ্ঞেস করছে… ফতেনগর…তারপর কী ? Not না Now…বোধ হয় Not…টরে টক্কা…না নিশ্চয় Now, য়্যাদ্দিন ধরে লড়াই চলছে, ফতেনগর দখল হ'বার দিন তো কবেই পেরিয়ে গেছে ! না, একবার মাস্টারবাবুকে জিজ্ঞেস করে নেয়া যাক। ওঃ মাস্টার ম'শায় পড়তে পারেন, এটা কি লিখেছে—Fatehnagar not captured না Fatehnagar now captured ?

মাস্টারবাবু একটু প্রসন্ন মনেই ঘরে বসে ছিলেন। আজ বহু দিন পরে তাঁর তৃতীয় পক্ষের গৃহিণীর সঙ্গে একটা মীমাংসা হয়েছে। গৃহিণীর মান ভাঙ্গাতে পেরেছেন। এ কী চাট্টিখানি কথা ! মাস্টার-বাবু নিজের চেয়ারে বসেই প্রশ্ন করলেন, কি হলো সারখেলবাবু ?

: এই দেখুন না, কি বিপদ ! আমাদের এক রিপোর্টার সাহেব লিখেছেন ফতেনগর…

তারপর বাকিটা ঠিক পড়তে পারছি নে। 'নট ক্যাপচারড্', না 'নাউ ক্যাপচারড'। কী হবে এটা ?

মাস্টারবাবু জবাব দিলেন : সত্যি সারখেল বাবু, আপনার বলিহারি বুদ্ধি, কতো বার না আপনাকে বলেছি 'সেণ্টেন্সের' থেকে

আসল মানেটা করে নেবেন। ছিঃ ছিঃ, এই সামান্য জিনিসটা পড়তে আপনার এতো সময় লাগে? সত্যি বাপু! হ্যাঁ, কী বলছিলেন? 'নট ক্যাপচারড্' না 'নাউ ক্যাপচারড্'। আরে এ তো একদম সহজ কথা। এ বুঝতে আবার দেরী হয় নাকি? য়্যাদ্দিন ধরে এই তল্লাটে রিপোর্টার সাহেবরা কি আর বসে বসে ঘাস খাচ্ছেন? ওটা 'নাউ' হবে। আপনি টেলিগ্রাম দিন পাঠিয়ে।

টেলিগ্রামটা এক বার পাঠানো হয়ে গিয়েছিল, Fatehnagar not Captured বলে। মাস্টারবাবুর কথা শুতে সারখেলবাবু তাড়াতাড়ি সংশোধন করে দিলেন—Fatehnagar now Captured বলে।

···টরে-টক্কা ধারাপুকুর···Fatehnagar now captured. Fatehnagar not captured নয়।

* * *

ধারাপুকুরের টেলিগ্রাফ-মাস্টার তারাবাবু স্বামী জিবিদানন্দের চেলা বিপুলের সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন।

রোজই বিকেলে বিপুল তারাবাবুর কাছে আসেন। 'হরকরা'র তারের একটা কপি নিয়ে যেতে হয়। কারণ, গুরুদেব ধ্যানে বসেন আর প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বলে যান 'সমাচারের' ব্রজানন্দবাবু ও খগেনবাবুর কাছে।

আজ জিবিদানন্দ বিশেষ তাগিদ দিয়ে বিপুলকে তার-অফিসে পাঠিয়েছেন। অনেক দিন ধরে ব্রজানন্দকে কোন চাঞ্চল্যকর খবর বলা হয়নি। একটা কিছু না বললে আর মুখ রক্ষা হচ্ছে না।

তারাবাবু ও বিপুল গল্প করছে, এমনি সময় তার-অফিসের যন্ত্রটা নড়ে উঠলো। টরে-টক্কা, হ্যালো ধারাপুকুর। 'হরকরা'র জন্যে তার আছে। তারাবাবু টরে-টক্কা শুনে একটু সচকিত হয়ে বসলেন। হ্যালো : টরে-টক্কা এই যে ধারাপুকুর। কী ব্যাপার···টরে টক্কা।

'হরকরা'র টেলিগ্রাম······টরে-টক্কা······কী খবর···Fatehnagar not captured.

তাই নাকি?···টরে-টক্কা···খবরটা পেয়েই তারাবাবু চিৎকার করে উঠলেন। বললেন: বিপুল, বিরাট খবর···ফতেনগর নট ক্যাপচারড্, আরে আমি তো আগেই জানতুম। হাঁ, হাঁ, নট ক্যাপচারড্······

তারাবাবুর মুখ থেকে কথাটা বেরুবা মাত্র বিপুল আর দেরী করলে না। বললে: কী বললেন?

: এ তো বিরাট খবর দেখছি। Fatehnagar not captured.

: না, আর দেরী নয়। এক্ষুণি গুরুদেবের কাছে যেতে হচ্ছে। ফতেনগর নট ক্যাপচারড্। ওরে বাবা, এ যে বিরাট কাণ্ড! এই লড়াই আর ক' দিন চলবে। এদিকে গুরুজী তো বাণী দিয়ে বসে আছেন যে, সাত দিনের মধ্যে এই লড়াইব সমাপ্তি। এখন? না, শীগ্‌গিবিই এই ভবিষ্যদ্বাণী পালটাতে হবে। নইলে একটা কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে। বিপুল আর দেবী করলে না। তারাবাবুব কথা শেষ হওয়ামাত্র দৌড়ে গুরুজীব কাছে চলে গেলো।

টেলিগ্রাফ-অফিসের তার যন্ত্রটা তখনও টরে-টক্কা করছে। তারাবাবু লিখে নিচ্ছেন। টবে-টক্কা-টরে-টক্কা···Fatehnagar now captured. Iatehnagai now captuied ওটা 'নট' নয়, 'নাউ' হবে।

: ওহে বিপুল, ফতেনগব 'নাউ' ক্যাপচারড্—'নাউ ক্যাপচারড্'··· বিপুল, কোথায় গেলে হে। ওটা 'নট ক্যাপচারড্' নয়—'নাউ ক্যাপচাবড্' হবে। বিপুল—বিপুল···তারাবাবু যন্ত্রটা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, আচ্ছা ফ্যাসাদে তো পড়া গেলো। টেলিগ্রাম শেষ না হতেই বিপুল চলে গেলো! এখন কী করি···ফতেনগর 'নাউ ক্যাপচারড্' আর বিপুল যে খবর নিয়ে গেলো ফতেনগর 'নট ক্যাপচারড্'।

কী বিশ্রী কাণ্ড রে বাবা! দুত্তোর ছাই! কি হবে আর চিন্তা করে···তারাবাবু টেলিগ্রাম 'হরকরা' দপ্তরে পাঠিয়ে দিলেন।

* * *

স্বামী জিবিদানন্দ ধ্যানে বসেছেন। সামনেই ব্রজানন্দবাবু ও খগেনবাবু বসে আছেন। একটু বাদে জিবিদানন্দ চোখ খুললেন।

: খবর যে বিশেষ সুবিধের নয় ব্রজ! শনি ও বৃহস্পতির যোগাযোগ কেটে গেলো। ভেবেছিলাম এই দুই গ্রহের মিলনে হয়তো লড়াই বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু না, এখন দেখছি আরও কয়েক দিন লড়াই চলবে।

ঃ আজকের ফ্রণ্টের খবরটা একটু বলুন না। খগেনবাবু একটু ভীত কণ্ঠেই প্রশ্ন করেন।

ঃ কী আর হবে···ফতেনগর নট ক্যাপচারড্ মানে এখনও দখল হয়নি। জোর যুদ্ধ চলছে,···হতাহতের সংখ্যা···দাঁড়াও বলছি···প্রায় হাজার পনেরো হবে। চলবে এ লড়াই বেশ কয়েকটা দিন·· প্রায় দু'বছর তো নিশ্চয়!

: দু' বছর ··বলেন কী গুরুদেব? ব্রজানন্দবাবু এবার প্রশ্ন করেন।

ঃ তা হলে তুমি কি ভেবেছিলে ব্রজ? দু' দিন হবে এ লড়াই? ছোাঃ। সে বার হান্‌ড্রেড ইয়ার্স ওয়ারে ভীম, অর্জুন সবাই এসে যখন···

কথাটা শেষ হবার আগেই খগেনবাবু প্রশ্ন করেন—আপনি মহাভারতের যুদ্ধের কথা বলছেন?

: আরে রামোচন্দোর! মহাভারতের কথা বলছি নে—'পোস্ট মহাভারত ওয়ারের' পর অর্জুন-ভীমকে এক বার ভাড়া করে 'হানড্রেড ইয়ার্স ওয়ারে' নাবানো হয়েছিল। ওদের লড়াই'র দু-একটা নূতন কসরৎ দেখানো হবে বলে।

: তারিখটা যদি বলেন, তা হলে সুবিধে হয়। হেড লাইনে দিতে পারবো—খগেনবাবু আবার কাতর কণ্ঠে বলেন।

: না, না ওই যুদ্ধের হিস্ট্রি এখনও লেখা হয়নি। সেদিন তোমাদের গভর্নমেণ্টের এক ছোঁড়া এসে বললে যে, এই হান্‌ড্রেড ইয়ার্স ওয়ারের একটা পূর্ণ ইতিহাস প্রকাশ করা হবে। আমাকেই বলেছে প্রিফেস লিখে দিতে। তাই ভাবছি···

স্বামী জিবিদানন্দের কথাটা শেষ হবার আগেই খগেনবাবু ব্রজানন্দবাবুর কানে কানে ফিস-ফিস করে বললেন: একদম ফাষ্টো ক্লাস নিউজ। গত দশ বছরের মধ্যে এমনি খবর ছাপিনি। এ খবর দিয়ে স্পেশাল এডিশন বের করলে কাগজ হু-হু করে বিকিয়ে যাবে।

ব্রজানন্দবাবু জবাব দেন: তা হ'লে আর দেরী নয়। 'হরকরা' বাজারে বেরুবার আগে কাগজ বেরুনো চাই। গুরুদেবের ফটো ও বাণী সহ। আর ফতেনগরের একটা ম্যাপ।

: ফতেনগরের ম্যাপ তো দপ্তরে নেই স্যর—বিষণ্ণ বদনে খগেন বাবু বললেন।

: না আছে তো বয়েই গেলো। গত রোববার যে আইসল্যাণ্ডের ম্যাপটা ছেপেছিলেন, ঐটেই উল্টো করে ছেপে দিন। কার সাধ্যি আছে যে, বলে ওটা ফতেনগরের নয়। শুধু নজর রাখবেন 'হরকরা' যেন টের না পায়। তা হ'লেই মুস্কিল।

এবার খগেনবাবু স্বামী জিবিদানন্দকে বললেন: গুরুদেব, আপনার বাণী দিয়ে আমরা একটা বিশেষ সংখ্যা বের করছি। 'ফতেনগর নট ক্যাপচারড্।'

স্বামী জিবিদানন্দ একটু মৃদু হাসলেন। বললেন: ব্রজ, কাজটা ভালোই করছো। হ্যাঁ, আর একটা কথা। বিপুল বলছিল ওর নাম

নাকি আজ পর্যন্ত কাগজে বেরোয় নি। কাগজের কোন এক জায়গায় ওর নামটা ঢুকিয়ে দিতে পারো না?

: আপনি সে জন্যে চিন্তা করবেন না স্যর! সব ঠিক হয়ে যাবে।

*　　　　*　　　　*

'হরকরা' দপ্তরে টেলিগ্রাম পেয়ে সাধনবাবু চিৎকার করে উঠলেন।

: কী হলো স্যর—প্রিয়ব্রত-উমাকান্তের দল এগিয়ে এলো।

: ফতেনগর নাউ ক্যাপচারড্। বিরাট স্কুপ—বিংশ শতাব্দীর সব চাইতে বড়ো খবর।

: প্রিয়ব্রত বাবু, আমাদের স্পেশাল বের করতে হবে। মেসিন বন্ধ করে ডাক-সংস্করণ ছাপা বন্ধ করুন। তৈরী করুন স্পেশাল। না, না 'প্লেট' চেঞ্জ করার দরকার নেই। একদম আলাদা সংস্করণ হবে। 'স্ট্রীমার' হেডলাইন। আপনার কাগজ তৈরী করুন, আমি পতিতপাবনবাবুকে খবরটা দেখিয়ে আনছি।

*　　　　*　　　　*

ফতেনগর দখল হয়েছে খবরটা শুনে পতিতপাবনবাবু চম্‌কে উঠলেন। বললেন : বলেন কী সাধনবাবু?

: হ্যাঁ স্যর, বুটলোকে আমরা তার পাঠিয়েছিলাম, Confirm or deny the fall of Fatehnagar-এব জবাবে বুটলো লিখেছে: Fatehnagar now captured, আমরা এ খবর দিয়ে স্পেশাল বের করছি।

: আলবাৎ বের করবেন। হ্যাঁ, সেই সঙ্গে গুরুদেব স্বামী খলিলানন্দের ফটো ও বাণী দিন। যুদ্ধ ও শান্তির উপর বাণী। লোক পাঠান ওঁর কাছে। বাণী নিয়ে আসুক। হাঁ, আর একটা কথা। ফতেনগরের একটা ম্যাপ ছাপছেন তো।

: ফতেনগরের ম্যাপ তো নেই দপ্তরে—করুণ কণ্ঠে সাধনবাবু জবাব দেন।

: তা হ'লে আপনারা আছেন কী করতে? কুছ পরোয়া নেই। আলগড়িয়া বলে যে জায়গাটা আছে—

: আলগড়িয়া! বিস্মিত কণ্ঠে সাধনবাবু প্রশ্ন করলেন। এই জায়গাটা কোথায় স্যর?

: সাধনবাবু, আপনাকে দিয়ে কিস্‌সু হবে না। আপনি নিশ্চয় স্কুলে জিওগ্রাফি পড়েছেন। পড়েন নি 'আলগড়িয়া কার্পাস তুলার জন্য প্রসিদ্ধ?'

: ও স্যর, আপনি 'আলজেরিয়ার' কথা বলছেন। আফ্রিকার সেই দেশটার কথা বলছেন তো?

পতিতপাবনবাবু চিরকালই ইংরেজী বর্জনের পক্ষপাতী। আজ এই 'আলজেরিয়ার' প্রসঙ্গের পর তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন যে, এই ভাষা যতো শাগ্‌গিরই বর্জন করা যায় ততোই মঙ্গল।

: ঠিক বলেছেন। আপনাদের ঐ আলজেরিয়ার একটা ম্যাপ ছেপে দিন। কালির ইম্প্রেশনটা একটু বেশী করে দেবেন, যাতে 'সমাচার' টের না পায় যে, ওটা আলজেরিয়ার ম্যাপ। ওরা টের পেলে আর রক্ষে রাখবে না।

: ঠিক আছে, আপনি চিন্তা করবেন না। আমি সব ঠিক করে দেবো—সাধনবাবু জবাব দিলেন।

: হাঁ, আর একটা কথা। রমণীবাবুকে বলুন, ঐ ইংরেজী ভাষা বর্জনের উপর একটা আন্দোলন করতে হবে। কি বলেন?

: ঠিক বলেছেন স্যর! 'সমাচার' আন্দোলন স্বুরু করার আগেই আমাদের স্বুরু করা উচিত।

: ঠিক তাই—পতিতপাবনবাবু জবাব দেন।

*　　　*　　　*

—এগারো—

বিকেল সাড়ে পাঁচটা।

অফিস-ফেরতা সবার হাতে একখানা করে 'দৈনিক সমাচার।'

বাসের মধ্যে এক ভদ্রলোক তন্ময় হয়ে সমাচারের বিশেষ সংখ্যা পড়ছেন। 'ফতেনগর দখল হয়নি। আরো বহু দিন চলবে এই লড়াই, স্বামী জিবিদানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী।'

এক যাত্রী মন্তব্য করলেন : ছুয়ো ম'শায়। ফতেনগর তো সামান্য একটা গ্রাম, সেইটে দখল করতে লোকগুলো হিমসিম খেয়ে গেলো! এ কি লড়াই হচ্ছে না যাত্রা হচ্ছে?

অপর এক যাত্রী জবাব দিলেন : ফতেনগর যে গ্রাম এ কথা কে বললে? ঐ দেখুন না ফতেনগরের ম্যাপ। বাপস্ কী প্রকাণ্ড জায়গাটা!

: ফতেনগরের ম্যাপ বেরিয়েছে না কি? 'সমাচার' তো দারুণ স্কুপ করলে ম'শায়। আজ ক'দিন ধরে এই লড়াইর খবর বেরুচ্ছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ একটা ম্যাপ ছাপলে না, বললে না ফতেনগরটা কোথায়। আর সব রদ্দি মার্কা খবর ছাপছে।—প্রথম যাত্রী বললেন।

: খবর কি আর বেরুবার যো আছে মশায়! সব খবরই তো সরকার 'সাপ্রেসড' করে দিচ্ছে। এই তো পরশু দিন আমাদের বাড়ির সামনে একটা কুরুক্ষেত্র হয়ে গেলো। একটা অক্ষরও বেরুলো না কাগজে। ছিঃ ছিঃ—তৃতীয় এক যাত্রী মন্তব্য করেন।

: যা বলেছেন দাদা ! আমাদের কোম্পানিতে ছাঁটাই হচ্ছে, আজ পর্যন্ত কাগজওয়ালারা এ নিয়ে একটা কথা লিখলে না !—চতুর্থ যাত্রী বললেন।

প্রথম যাত্রী বুঝতে পারলেন যে মূল আলোচনা থেকে তাঁরা দূরে সরে যাচ্ছেন। তাই আবার ফতেনগর প্রসঙ্গটা নিয়ে আলোচনা সুরু করলেন। বললেন : যাই বলেন না, এ সব ব্যাপারে সমাচার চমৎকার কাগজ। ঐ স্বামী জিবিদানন্দের কী মর্মস্পর্শী বাণী ছেপেছে পড়ুন না। বেশ চিন্তার কথা বলেছেন উনি—

: স্বামী জিবিদানন্দের কথা বলছেন তো !—আরে ম'শায়, উনি তো পণ্ডিত মানুষ—তৃতীয় যাত্রী মন্তব্য করেন।

: ফিলসফার গাইড ম'শায়। শুনেছি দশ-দশটা বিদেশী ভাষা জানেন। যদি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ না করতেন, তা হ'লে উনিই তো য়্যাদ্দিনে দেশের এক জন মহারথী হয়ে যেতেন।

: যা বলেছেন—চতুর্থ যাত্রী মন্তব্য করেন।

এই রকম ধরনের টুকরো কথা যখন বাসের মধ্যে চলছিল তখন হঠাৎ হকারের চিৎকার শোনা গেলো : ফতেনগর কামাল হো গিয়া। ফতেনগর কামাল হো গিয়া। 'হরকরা' স্পেশাল এডিশন পঢ়্ লিজিয়ে।

বাসের সবাই ঝুঁকে পড়লেন।

প্রথম নম্বর যাত্রী বললেন : ও মশায়, বলছে কী ! এ যে দেখছি অবাক কাণ্ড ! ফতেনগরের বারোটা বেজে গেলো।—এই 'হরকরা' দাও দিকিনি এক কপি।

শেষের কথাগুলো হকারকে উদ্দেশ্য করে বলা।

দু'নম্বর যাত্রী বলেন : আমি তো প্রথম থেকেই বলছিলুম দাদা, সরকার নিউজ 'সাপ্রেসড' করছে।—

তৃতীয় যাত্রী মন্তব্য করলেন : আরে, ফতেনগর হলো এক ছোট গ্রাম। ঐটে দখল করতে এতো কাণ্ড! ১৯১৪ সালের লড়াইতে, বুঝলেন দাদা—

ভদ্রলোকের কথা শেষ হবার আগেই চতুর্থ নম্বর যাত্রী বললেন : ফতেনগর যে ছোট গ্রাম, এ কথা কে বললে আপনাকে শুনি? ও মশায়, দাদাকে একটু শুনিয়ে দিন না ফতেনগরের আয়তনটা কতো।

: আয়তন তো দেয়নি, কিন্তু একটা ম্যাপ দিয়েছে। কিন্তু কিছুই যে বুঝতে পারছিনে। সব কালো হয়ে গেছে কালিতে!

: ও আর নতুন কি দাদা! ঐ যে রণজিৎ সিংগি না কে বলেছিল 'সব লাল হো জায়েগা।' আর আজ-কাল কালো হবে এতে আর আশ্চয্যি হবার কী আছে! এ তো কালোবাজারীর যুগ—দ্বিতীয় যাত্রী বললেন।

তৃতীয় যাত্রী এবার মন্তব্য করেন : আর ইদিগে আমাদের 'সমাচারের' কাণ্ডখানা দেখেছেন? যত সব ভুল খবর ছেপে বসে আছে।

চতুর্থ যাত্রী এবার বলেন : আরে ছুত্তোর মশায়, 'সমাচারের' কথা ছেড়ে দিন। আমার সাহেব বলেন, 'লাহিড়ী, তোমার ডিপার্টিমেণ্টকে ছাখো 'সমাচার' কতো গালিগালাজ করেছে।' আমি কি বলেছি জানেন? বলেছি, সাহেব, 'সমাচারের' নিন্দে গালমন্দ নয়, ওটা প্রশংসাপত্র।

: যা বলেছেন। আর এই দিকে দেখুন 'সমাচার' কোথাকার একটা 'হনলুলু' না 'পাগো-পাগো' দেশের ম্যাপ ছেপে বসে আছে। ছিঃ! ছিঃ! এমনি ভাবে জনসাধারণকে ধাপ্পা দিচ্ছে 'সমাচার'—প্রথম যাত্রী বললেন।

: যা বলেছেন, স্ক্যাণ্ডালাস! ঐ যে স্বামী জিবিদানন্দ। ঐ ব্যাটাই তো 'সমাচার'কে সব পরামর্শ দেয়। লোকটা ঠগ, জোচ্চোর।

আর এক যাত্রী বললেন: কাগজের কথাই যদি বলেন, তাহ'লে বলুন 'হরকরা'। সব টাটকা খবর ছাপে। আর কী চমৎকার ছবি! আর এডিটোরিয়াল! এই দেখুন না, আজকে কি লিখেছে-- 'বলো কথা'। আহা কী চমৎকার, মার্ভেলস! লিখতে পারবে এমনি রকম কেউ এডিটোরিয়াল? হ্যাঁ, লিখতে পারতেন এই ধরনের সম্পাদকীয় শুধু মাত্র সুরেন বাঁড়ুয্যে।

যিনি চার পয়সা দিয়ে 'সমাচার' কিনেছিলেন তাঁর মুখে শুধু একটা করুণ আর্তনাদ শোনা গেলো। শুধু কাতর কণ্ঠে বললেন: ওঃ দাদা, আমার পয়সা চারটা তাহ'লে জলে গেলো—

এক জন মন্তব্য করলেন: স্রেফ গঙ্গায়—

আর একজন ছড়া কেটে বললে:

"এক্ষুণি দাদা চড়ে টঙ্গায়,
ভাসিয়ে আসুন 'সমাচার' মা গঙ্গায়।"

ক্রেতা এবার উত্তেজিত হয়ে বললেন: আমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজী চলবে না বলে দিচ্ছি। ঐ 'সমাচারে'র সম্পাদকের নামে আমি 'কেস' ঠুকবো। কতো ধানে কতো চাল বুঝিয়ে দেবো বাছাধনকে—

বাসের যাত্রীরা একমতে স্বীকার করলে যে, এ যুগের শ্রেষ্ঠ কাগজ 'হরকরা'। 'সমাচার' অতি বাজে কাগজ।

* * *

স্বামী জিবিদানন্দ বসে বসে চা পান করছিলেন। সামনে বিপুল বসে। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল।

: কী ব্যাপার ?   জিবিদানন্দ প্রশ্ন করলেন।

: সর্বনাশ হয়ে গেছে গুরুদেব—টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে ব্রজানন্দবাবু কাতর কণ্ঠে বললেন।

: কী হলো ?—

: আজ্ঞে, আমার দপ্তরের সামনে প্রায় হাজার খানেক লোক। বলে 'সমাচার' বিশেষ-সংখ্যা কিনেছি। ভুল খবর ছেপেছো। পয়সা ফেরৎ দাও নইলে মজা দেখাচ্ছি। লোকগুলো গুরুদেব, ভয়ানক উত্তেজিত।

: ভুল খবর ? সে আবার কী ! সমস্ত কথা খুলেই বলো না ?—স্বামী জিবিদানন্দ বললেন।

: আর কী বলবো গুরুদেব ! ঐ পতিতপাবনের 'হরকরা'ই সব সর্বনাশের মূল। আমরা স্পেশাল বের করার একটু বাদে 'হরকরা' বিশেষ-সংখ্যা বের করেছে। ঠিক আমাদের উল্টো খবর ছেপে বসে আছে—অর্থাৎ কি না ফতেনগর নাউ ক্যাপচারড্। এ নিয়েই বাইরের লোকগুলো চিৎকার হল্লা করছে। আমায় যে এরা একেবারে ধনে-প্রাণে মারলে। আপনি এসে এদের একটু শান্ত করুন না—

টেলিফোন কেটে দিলেন স্বামী জিবিদানন্দ। বললেন : বিপে, হরিদ্বারের গাড়ি ক'টায় বল দিকিনি।

: —রাত সাতটায়।

: তা হলে চল। আজই রওয়ানা হয়ে পড়ি। ট্যাক্সি ডাক। অনেকদিন শ্রীভগবানের দর্শন পাইনে। তাই মনটা বড়ো কাতর হয়ে উঠেছে। আর দেরী নয়, গুছিয়ে নাও। সময় হাতে নেই। যে কোনো মুহূর্তে ওরা আসতে পারে।

*   *   *

—বারো—

আয়নার সামনে বসে চুকন্দর সিং নিজের গোপটা চুমরে নিচ্ছিলেন। এমনি সময় দৌড়ে এলো বন-বন চৌবে।

ঃ কী ব্যাপার, এই অসময়ে আবার বিরক্ত করতে এলেন কেন ?

ঃ স্যর, 'হরকরা' কাগজ পড়ুন। দেখুন কি লিখেছে। 'ফতেনগর নাউ ক্যাপচারড।'

খবরটা পড়ে চুকন্দর বিস্মিত হয়ে গেলেন। এই লড়াইয়ের হর্তা-কর্তা বিধাতা তিনি। অথচ ফতেনগর দখল হয়ে গেলো এ খবরটা তাঁকে জানানো হয় নি! তিনি প্রায় চিৎকার করেই বললেন : আমার সি, আই, ডি, গুলো কী করে ? এই রকম খবর আমায় দেয়নি কেন ? ডাকুন তো ওদের—

একটু ইতস্তত করে বন-বন বললে : আজ ভোর থেকে ওদের পাচ্ছিনে।

: পাচ্ছেন না! কী ব্যাপার ?

: আজ্ঞে, রোজই বিকেলে ওরা ডাকঘরে যায়। রিপোর্টারদের কপি থেকে যুদ্ধের খবর নিয়ে আসে। কাল বিকেলে ওরা একটু সিনেমায় গিয়েছিল। তাইতো অতো বড়ো খবরটা আনতে পারেনি। বোধ হয় এখন আনতে গেছে।

এর পরে চুকন্দর আর কি বলতে পারেন ?

তার পর জিজ্ঞেস করলেন : লুটেরা ছবেকে টেলিফোন করেছিলেন ? কি বলে লুটেরা ? লড়াই চলছে না বন্ধ হয়ে গেছে ?

: সে কথা তো জিজ্ঞেস করা হয়নি—বন-বন জবাব দিলে।

: তা হ'লে কী ছাই করছেন? দিন দেখি টেলিফোনটা?

* * *

'ফরোয়ার্ড এরিয়ায়' লুটেরা ডুবে গুম্ হয়ে বসে ছিলেন। মন তাঁর প্রসন্ন নেই, কারণ এ কয়েকটা রাত মশার উপদ্রবে তিনি একদম ঘুমুতে পারেন নি। এই অনিদ্রার দরুণ তাঁর রক্তশূন্যতার ব্যামো হয়েছে। এমনি সময় চুকন্দর সিং-এর টেলিফোন এলো।

: হ্যালো, লুটেরা? 'এনিমি'রা কখন এলো?

এই অসুখের দরুণ লুটেরা আজ-কাল একটু কম শুনতে পাচ্ছেন। তিনি শুনতে পেলেন লুটেরা 'এনিমিয়া' কখন হলো?

তাই জবাব দিলেন: পরশু রাত্রে। কী যন্ত্রণাই না দিচ্ছে স্যর! আসল 'মসকুইটো' আক্রমণ করেছিল কাল রাত্রিবেলা। লুটেরার জবাব শুনে চুকন্দর ঢোঁক গিললেন। এবার একটু কণ্ঠস্বর নামিয়ে বললেন: বলো কী হে! 'মসকুইটো' য়্যাটাকস্! এ তো বিরাট কাণ্ড দেখছি! একটু বাদে আবার প্রশ্ন করলেন: আমাকে আগে বলোনি কেন?

লুটেরার মাথা যেন বনবন করে ঘুরছে। তিনি শুনতে পেলেন: ডাক্তারকে আগে বলোনি কেন?

লুটেরা জবাব দিলেন: সে সুবিধে আর পেলাম কোথায়? তার আগেই তো কাহিল হয়ে—মানে কুপোকাৎ হয়ে পড়েছি।

হাত থেকে রিসিভারটা খসে পড়লো চুকন্দরের। শুধু একবার বললেন: সারেণ্ডার করলে লুটেরা?

এবার লুটেরার কানে শুধু 'সারেণ্ডার' কথাটি ভেসে এলো। আর দেরী নয়। এক্ষুণিই হেস্তনেস্ত করে দে'য়া প্রয়োজন। নইলে

হয়তো কর্তার মত পাল্টাতে পারে। তিনি বললেন: সে জন্যে ভাববেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

একটু বাদে রণাঙ্গন ক্ষেত্রে সন্ধির পতাকা উড়তে লাগলো। সেই সঙ্গে সঙ্গে বাজতে লাগলো যুদ্ধ সমাপ্তির বিউগল।

* * *

—তেরো—

ময়দানে মিটিং হচ্ছে। দুটো ভাঙ্গা চেয়ার, চারটে পতাকা—ছিন্ন ছাতির কাপড় দিয়ে তৈরী। দেশনেতা হারাণ চাটুজ্যের বক্তৃতা হবে। 'ফতেনগরের লড়াই ও অতঃপর।'

হারাণ চাটুজ্যে তাকিয়ে দেখলেন, তার মিটিং-এ জনসমাগম বিশেষ হয়নি। ঐ তো রাস্তার পাশের মাঠে কাতারে-কাতারে লোক হয়েছে। দেশনেতা বাবুলাল সিংগী বলছেন। বক্তৃতার বিষয়: 'লড়াই শেষ হলো কেন?'

এক বার করুণ চক্ষে হারাণ চাটুজ্যে বাবুলাল সিংগীর ময়দানের দিকে তাকালেন। তার পর নিজের মিটিংএর লোক গুণতে লাগলেন···এক, দুই···তিন···সবশুদ্ধ বারো। এর মধ্যে তিন জন ভলান্টিয়ার, হারাণ চাটুজ্যের ভাগ্নে ও বন্ধু। বাকী সাত জন ঐ বড়ো মিটিং-এ জায়গা পায়নি বলে এখানে এসেছে। অনেকক্ষণ ধরে হারাণ চাটুজ্যে জনতার প্রতীক্ষায় রইলেন। আরো দু'জন লোক বাড়লো। পুলিশ বিভাগের কেউ হবে।

হারাণ চাটুজ্যে ভাবলেন যে, তাঁর বক্তৃতা শুরু হলে পর হয়তো জনতা বাড়তে পারে। তিনি বলতে লাগলেন: ফতেনগর! আপনারা জানেন কি ফতেনগরে শত্রুপক্ষের কেল্লাফতে হলো কেন?

জানেন না। বেশ, জিজ্ঞেস করুন ঐ বাবুলাল সিংগীকে, ঐ যে বড়ো মাঠে বসে বসে গলা ফাটাচ্ছে। আপনারা শুনুন, এই ফতেনগর…

হারাণ চাটুজ্যের বক্তৃতা শেষ হবার আগেই জনতার মধ্যে দু'জন উঠে দাঁড়ালো। তারা যাবার উপক্রম করলে। ভলান্টিয়ারদের এক জন চেঁচিয়ে বলে: যাবেন না। মিটিং-এর শেষে চা দে'য়া হবে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্যে লিলি বিস্কুটও আছে।

শ্রোতাদের মধ্যে এক জন জবাব দিলে: নহী জী! রাষ্ট্র ভাষামে বোলুন। হমি বংলা নহী সমঝি।

করুণ কণ্ঠে হারাণ চাটুজ্যে আবার তাকালেন। শ্রোতার সংখ্যা, ভলান্টিয়ার, আত্মীয়, পুলিশ বাদ দিয়ে পাঁচ জনায় এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি সর্ব্বান্তকরণে প্রার্থনা করতে লাগলেন, যেন আর একটা লড়াই হয়। তাহ'লে তিনি বাবুলালকে এক হাত দেখিয়ে দেবেন।

* * *

ফতেনগরে সন্ধির নিশান উড়বার সঙ্গে-সঙ্গে প্রেস-ক্যাম্প নিস্তব্ধ হয়ে গেছে।

সবাই চুপ। ফতেনগরের পতন হয়েছে, এতো বড়ো স্কুপ শুধু মাত্র যে শৈল পাবে এ কথা তারা কখনই কল্পনা করতে পারেনি। বিছানায় কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে রামগোপাল। ব্যারীর চুলগুলো এলোমেলো, তার কণ্ঠস্বর মিহি হয়ে গেছে। শৈল স্কুপ করার পর গিদোয়ানী ও আমি এসে প্রেস-ক্যাম্পে আস্তানা নিয়েছি। টেবিলের উপর শুয়ে আছে গিদোয়ানী। আমি চেয়ারে বসে। ঘরের মধ্যে শুধু উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে কমরেড নিটস্কি।

: অন্যায়, ঘোর অন্যায়। শৈলকে এ ভাবে 'এক্সক্লুজিভ' স্টোরী দে'য়া ঘোর অন্যায়। আমাদের 'প্রেস-কোডে'র বাইরে। উই মাস্ট প্রটেস্ট।

কম্বল থেকে মুখ বের করে রামগোপাল প্রশ্ন করলেঃ কার কাছে শুনি ?

ঃ কেন কর্তৃপক্ষের কাছে, নিটস্কি জবাব দেয়।

ঃ তোমার মাথা আর মুণ্ডু। নতুন গভর্নমেণ্ট এখনও পর্যন্ত কায়েমী হলো না, কর্তা পাবে কোথায় তুমি, শুনি ?

: তাহ'লে উই মাস্ট ডেমোনেস্ট্রেড।

ঃ নিটস্কি, আমায় একটু লেমনেড খাওয়াতে পারো ? নইলে ভাই 'ডেমোনেস্ট্রেড' করার শক্তি নেই। জানো, গত কুড়ি বছরের মধ্যে আমি এতো বড়ো বিরাট স্কুপ মিস করিনি।

ঃ কিন্তু একটা বিহিত করার সত্যিই প্রয়োজন। এ কি ঘোর অন্যায় নয় ? এতগুলো প্রেস-রিপোর্টার থাকতে এত বড়ো একটা স্টোরী শুধু মাত্র শৈলকে দে'য়া হলো ? আমরা আবেদন করবো।

ঃ ও-সব আবেদনে কিস্সু হবে না। বরং বলো আমরা প্রতিবাদ করবো। লেট আস্ ড্রাফট আওয়ার মেমোরাণ্ডাম—কাগজ-কলম নিয়ে কমরেড নিটস্কি বসলো।

ঃ কী লিখবে শুনি ?—রামগোপাল জিজ্ঞেস করে।

ঃ কেন লিখবো 'উই দি আনডারসাইনড করেসপণ্ডেণ্টস হিয়ার বাই প্রটেস্ট···না না, ভেহিমেণ্টলি প্রটেস্ট য়্যাণ্ড টেক একসেপশন···উঁহু একসেপশন নয়, বরং অবজেক্ট, অবজেক্ট টু দি ট্রিটমেণ্ট······

কমরেড নিটস্কি তার প্রতিবাদপত্র লিখতে লাগলো।

*   *   *

শৈলকে আড়ালে ডেকে আমি বললামঃ এটা কি ভালো হলো ?

বিস্মিত হয়ে শৈল বলেঃ কোনটা ?

: এই যে ফতেনগরের দখলের খবরটা। এক-যাত্রায় পৃথক ফল······

: সত্যি বলছি আমি তার পাঠিয়েছিলুম ··

আমি মনে মনে হাসি। সবাই এ কথা বলে থাকে। এটাই তো পাকা রিপোর্টারের চাল। আমি কি জানিনে। আলবাৎ জানি। এত বছর রিপোর্টারী করে চুল পাকিয়ে ফেললুম। সবই জানি, সবই জানি।

*　　*　　*

—চৌদ্দ—

আমার কথা ফুরুলো।

প্রারম্ভেই বলেছি যে, এ কাহিনী সাংবাদিক-জীবনের এক অংশ, অতি ক্ষুদ্রতম অংশ। তাদের বৃহত্তর জীবনের কাহিনী লিখতে গেলে এ কাহিনী শেষ করতে পারতাম কি না সন্দেহ! কারণ সে জীবনে রূপাও নেই, কথাও নিঃশেষিত, কিন্তু শুধু আছে গ্লানি, শুধু আছে শত বাধা-বিপত্তি। সেই দুঃখের জীবনীর মাঝে মাঝে যদি 'ফতেনগরের লড়াই'র মতো ছোটোখাটো ঘটনা না হতো তা হ'লে সাংবাদিক-জীবন সত্যিই দুর্বিসহ হয়ে পড়তো। তাদের বেদনাময় জীবনের মাঝে এই অনাবিল আনন্দটুকুই তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে।

*　　*　　*

আমার আর একটা কথা বলার আছে।

'ফতেনগরের লড়াই'র পর একদিন নিজের কর্মস্থলে ফিরে শুনতে পেলাম শৈল বুটলোর তদ্বিরে 'হরকরা'য় একটা

ভালো কাজ পেয়েছে। বুটলোরও তার ভগিনীপতির কাছে আদর বেড়েছে। এখন আর পয়সার জন্যে হাত পাততে হয় না। সুভাষিণী দেবী বুটলোর জন্যে 'হরকরা'র পাত্র-পাত্রী বিভাগে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। অতএব 'মন দে'য়া-নে'য়া' ক্লাবের সদস্যদের মেয়ে দেখার অজুহাতে চায়ের একটা পাকা বন্দোবস্ত হয়ে গেছে।

পতিতপাবনবাবু প্রস্তাব করেছেন যে, বিয়ের প্রারম্ভে বুটলোর দেশনেতা হওয়া প্রয়োজন। কোন্‌টা আগে হবে, বিয়ে না দেশনেতা, এ নিয়ে ঘোর বাদানুবাদ চলছে। 'সমাচার' কাগজের সম্পাদকীয়তে এর একটা ফলাফল শীগ্‌গিরই জানতে পারা যাবে।

*   *   *

প্লেনে আমি ও গিদোয়ানী একই সঙ্গে এলাম। নিজের সিটে বসে গিদোয়ানী একটা ম্যাগাজিন পড়ছিল। হঠাৎ আমায় প্রশ্ন করলো : একটা প্রশ্ন করবো দাদা!

: কী?

: আচ্ছা, রাইফেলের ট্রিগার ক'টা বলতে পারো?

আমি বিস্মিত হলাম। লোকটা বলে কী? রাইফেলের ট্রিগার ক'টা জানতে চায়! আশ্চর্যি!

আমি বলি : সে কি গিদোয়ানী, ফতেনগরে এত বড়ো একটা লড়াইর রিপোর্ট করে এলে, আর এখন কি না জিজ্ঞেস করছো, রাইফেলের ট্রিগার ক'টা?

এক-গাল হেসে গিদোয়ানী বলে : আরে রামোচন্দোর! তুমিও জানো আমিও জানি। ফতেনগরে কী দেখেছি, আর কী লিখেছি!

তার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে: তবু যদি একটা ফতেনগরে 'টয়'-পিস্তল দেখতে পেতাম তা হ'লে মনে আর কোন খেদ থাকতো না।

আমিও হাসি। বলি: ঠিক কথা ব্রাদার, সত্যি কী হলো আর কী লিখলাম। সাধে লোকে বলে: Imagination! thy name is Journalism.

শেষ